কমিটির নেই। এমন একটি স্থানে এই কেন্দ্রীয় সেক্রেটারিয়েট থাকবে যেখানে যেখানে সদস্যগণ অতি সহজে প্রবেশ করতে পারে। বিশপ সম্মিলনীগুলোর আর্থিক অনুদানে এই সেক্রেটারিয়েট এর কার্যক্রম পরিচালিত হবে। পরবর্তী বছর অনুসরণী সভা অনুষ্ঠিত হবে মর্মে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

বিশপগণ এতই উৎসাহী ছিলেন যে একটি মিটিং হওয়ার কথা থাকলেও তারপর পর তিনটি মিটিং এ মিলিত হন হংকং এ যথাক্রমে ১৯৭১, ১৯৭২ ও ১৯৭৩ খ্রিস্টাব্দে। তাদের প্রথম ঐতিহাসিক মিটিং অনুষ্ঠিত হয় ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দের মার্চ মাসে। বিভিন্ন বিশপ সম্মিলনী থেকে ১১ জন প্রেসিডেন্ট বিশপ এই মিটিং এ উপস্থিত ছিলেন। স্থায়ী কাঠামো তৈয়ারী হলো। নাম দেওয়া হলো এফএবিসি। কিন্ত দুভাগ্যক্রমে জানানো হলো যে রোমান কুরিয়া এশিয়ার বিশপ সম্মিলনীগুলোর সমাবেশের নেতিবাচক সমালোচনা করে মন্তব্য করছে। তাতে বিশপদের দুশ্চিন্তা বেড়ে যায়। কিন্তু কার্ডিনাল ক্যাসিডি রোমান কুরিয়াকে বুঝানোর ব্যাপারে বিশপদের আশ্বস্ত করলে তাঁরা কিছুটা স্বস্তি ফিরে পান এবং তাদের কার্যক্রম নিয়ে সামনে অগ্রসর হন। স্থায়ী কাঠামোর জন্য একটি বিধি তৈয়ারী করে ভাতিকানে পাঠানো হয় কিন্ত তা অনুমোদন না হওয়ায় বিশপগণ আশাহত হন। কেননা তাদের স্বপ্ন পূরণ হয়নি। তাই বিশপগণ এই মর্মে পোপের কাছে একটি পত্র লিখেছিলেন।

১৯৭২ খ্রিস্টাব্দে আর একটি ঐতিহাসিক মিটিং অনুষ্ঠিত হয় হংকং। সেই মিটিং এ বাংলাদেশ থেকে আর্চবিশপ মাইকেল রোজারিও উপস্থিত ছিলেন। এই মিটিং-এ বিধির দ্বিতীয় খসড়া প্রস্তুত করা হয়। ১৪টি বিশপ সম্মিলনীর মধ্যে ১২ সম্মিলনীর ভোটে বিধিটি অনুমোদন লাভ করে। এই অনুমোদিত দ্বিতীয় খসড়া বিধিটি নিয়ে ৩ জন কার্ডিনাল পোপের সাথে সরাসরি দেখা করতে যান। কিন্তু পরিতাপের বিষয় এই যে পোপের সাথে সাক্ষাতে কার্ডিনালগণ জানতে পারেন যে পোপ মহোদয় তাদের আগের বিধির খসড়া সম্পর্কে জানতেন না। যাহোক, পোপ ষষ্ঠ পৌল ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দের ১৬ নভেম্বর দুই বছরের জন্য বিধিটি অনুমোদন দেন। ভাতিকান কর্তৃক এই অনুমোদনের মধ্য দিয়েই এশিয়ার বিশপগণের বহু দিনের আকাঙ্ক্ষিত ও লালিত স্বপ্ন পূরণ হলো। এফএবিসি আনুষ্ঠানিকভাবে স্থায়ী প্রাতিষ্ঠানিক রূপ লাভ করলো। মিলন ও সংহতির যাত্রা শুরু হলো। পরবর্তীতে ১৯৭৩ খ্রিস্টাব্দে হংকং তৃতীয় ঐতিহাসিক মিটিং অনুষ্ঠিত হলো এবং এই মিটিং এ জেনারেল সেক্রেটারী নিয়োগ করা হয় এবং স্টেনডিং কমিটি গঠন করা হয়। এই সময়েই এই ফেডারেশনের অধীনে "মানব উন্নয়ন" নামক প্রথম দপ্তরট গঠিত হয়। পরবর্তীতে অন্যান্য দপ্তরগুলো খোলা হয় এবং বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন বিষয়ের ওপর সম্পূর্ণ সম্মেলন বা প্লেনারী এসেম্বলী অনুষ্ঠিত হয়।

৩। এফএবিসি এর সদস্য-সম্মিলনীসমূহ

বর্তমানে এশিয়ার ১৪টি বিশপ সম্মিলনী এফএবিসি এর পূর্ণ সদস্যপদ লাভ করেছে। সেই দেশগুলো হলো: বাংলাদেশ, ভারত, ইন্দোনেশেয়া, জাপান, বোরিয়া, লাওস-কম্বেযিয়া, মালয়েশিা-সিঙ্গাপুর-ব্রুনাই, মিয়ানমার (বার্মা), পাকিস্তান, ফিলিপাইন, শ্রীলঙ্কা, তাইওয়ান, থাইল্যান্ড ও ভিয়েতনাম। এছাড়াও এই এশিয়ার ফেডারেশনে ১০টি দেশ এসোসিয়েট সদস্যপদ লাভ করেছে। এই দেশগুলো হলো: হঙকঙ, কাজাকিস্তান. কির্গিস্তান, মাকাউ, মঙ্গোলিয়া, নেপাল, সাবেরিয়া, তাদজিকিস্থান, তুকৃনেনেস্থান এবং উবেকিস্থান।

৪। এফএবিসি এর কাঠামো ও দপ্তরসমূহ

এফএবিসি এর একটি শ্রেণীবিন্যাশগত কাঠামো রয়েছে, যেমন: (১) এশিয়ার বিশপ সম্মিলনীসমূহ (২) প্লেনারী এসেম্বলী যেখানে থাকবে এফএবিসি এলাকার অধিস্থ সকল কার্ডিনাল, সদস্য সম্মিলনীর প্রেসিডেন্ট বা সম্মিলনী কর্তৃক মনোনীত বিশপ প্রতিনিধি, এবং সদস্য সম্মিলনী কর্তৃক নির্বাচিত প্রতিনিধি। এই প্লেনারী এসেম্বলীই হলো এফএবিসি এর সর্বোচ্চ কর্তৃত্বের অধিকারী এবং নীতি নির্ধারনী বডি যার কাছে অন্যান্য সকল কমিটি ও দপ্তরগুলো জবাবদিহী করবে; (৩) রেজিওনাল এসেম্বলীসমূহ: রেজিওনাল এসেম্বলী হলো ভৌগলিক অঞ্চলভেদে বিশপ সম্মিলনীসমূহের সেচ্ছাসেবক এসোসিয়েশন। স্টেনডিং কমিটিতে থাকা সেই অঞ্চলের প্রতিনিধি এই এসোসিয়েশনের আহ্বায়ক হিসাবে কাজ করবেন; (৪) সেন্ট্রাল কমিটি: এই কমিটি গঠিত হবে সদস্য বিশপ সম্মিলনীরসমূহের প্রেসিডেন্টগণ বা মনোনীত বিশপ প্রতিনিধি এবং এসোসিয়েট সদস্যদের মধ্য থেকে মনোনীত একজন বিশপ এর সমন্বয়ে। প্লেনারী এসেম্বলীর সিদ্ধান্ত ও নির্দেশনা বাস্তবায়ন এবং স্টেনডিং কমিটি ও সেক্রেটারিয়েটের কার্যক্রম তদারকি করাই হবে এই সেন্ট্রাল কমিটির কাজ; (৫) স্টেনডিং কমিটি: এই কমিটি গঠিত হবে ৫ জন বিশপ নিয়ে: সেন্ট্রাল কমিটির সদস্যদের মধ্য থেকে ৪ জন সদস্য এবং এফএবিসি এর সভাপতি যিনি আহ্বায়ক হিসাবে দায়িত্ব পালন করবেন; (৬) সেন্ট্রাল সেক্রেটারিয়েট: এই সেন্ট্রাল সেক্রেটারিয়েটই হলো এফএবিসি এর প্রধান সেবা সংস্থা এবং এফএবিসি ও বাইরের দপ্তর এবং সংস্থাগুলোর মধ্যে সমন্বয় সাধন করবে।

এই কাঠামোর আওতায় রয়েছে ৯টি বিশেষায়িত দপ্তর, ৪টি ডেস্ক ও একটি ডকুমেন্টেশন সেন্টার যেগুলো এফএবিসি এর সেবা সংস্থা হিসাবে সেবা দিয়ে যাচ্ছে। এই দপ্তরগুলো সেন্ট্রাল সেক্রেটারিয়ট এর সহযোগিতায় সেন্ট্রাল কমিটি ও স্টেনডিং কমিটির তত্ত্বাবধানে কাজ করে থাকে। এই দপ্তরগুরলো হলো: (১) মানব উন্নয়ন বিষয়ক, (২) সামাজিক যোগাযোগ বিষয়ক, (৩) শিক্ষা ও বিশ্বাসের গঠন বিষয়ক, (৪) মাণ্ডলীক ঐক্য ও আন্তঃধর্মীয় সংলাপ বিষয়ক, (৫) মঙ্গলবাণী প্রচার বিষয়ক, (৬) ঐশতত্ত্ব বিষয়ক, (৭) ধর্মযাজক বিষয়ক, (৮) ভক্তজনগণ ও পরিবার বিষয়ক এবং (৯) উৎসর্গীকৃত জীবন বিষয়ক দপ্তর। ভক্তজনগণ ও পরিবার দপ্তরের আওতায় রয়েছে ৩টি ডেস্ক: এগুলো হলো, (১) যুব-বিষয়ক ডেস্ক, (২) নারী বিষয়ক ডেস্ক, এবং (৩) মৌলিক খ্রিস্টীয় সমাজ বিষয়ক ডেস্ক। এশিয়ার বিশপ সম্মিলনীগুলোর আওতায় রয়েছে: (১) আবহাওয়া পরিবর্তন বিষয়ক ডেস্ক, এবং (২) ডকুমেন্টেশন সেন্টার।

এই বিশেষায়িত দপ্তরগুলোর কাজ হলো: প্রদত্ত শর্তাবলী অনুসারে উদ্যোগ গ্রহণ করা এবং উপযুক্ত কার্যক্রম পরিচালনা করা, এবং এফএবিসি এর সিদ্ধান্ত ও নির্দেশনা বাস্তবায়ন করা; তাদের কার্যক্রমের সাথে সম্পর্কযুক্ত জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ের অঙ্গ-সংগঠনগুলোর সাথে যোগাযোগ স্থাপন করা; বিভিন্ন বিষয় অধ্যয়ন করা এবং তাদের দক্ষতার ক্ষেত্রগুলোতে ডকুমেন্টেশন সরবরাহ করা; এফএবিসি এর সদস্য সম্মিলনী ও এসোসিয়েট সদস্যদের কাছে তথ্য সরবরাহ করা ও তাদের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করা।

৫। এফএবিসি এর প্রকাশনাসমূহ

এফএবিসি বিভিন্ন দপ্তরে বিভক্ত হয়ে কার্যক্রম পরিচালনা করছে। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন প্রকাশনার কাজও করে থাকে। বিগত বছরগুলোতে এফএবিসি বিভিন্ন বিষয়ের উপর অনেক গুরুত্বপূর্ণ লেখা প্রকাশ করেছে। বিভিন্ন দপ্তরগুলো নিজ নিজ ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ প্রাসঙ্গিক, বাস্তবধর্মী ও তথ্যসম্বলিত পুস্তক প্রকাশ করে থাকে যা এশিয়ার মণ্ডলী তথা জনগণকে আলোকিত ও সমৃদ্ধ করে থাকে। বিভিন্ন সময়ের অনুষ্ঠিত ১১টি প্লেনারি এসেম্বলীগুলোর চূড়ান্ত বিবৃতি এবং বিভিন্ন দপ্তরগুলোর প্রকাশনার সমন্বয়ে "For All the Peoples of Asia" শিরোনামে গুরুত্বপূর্ণ দলিল কয়েকটি খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে। তাছাড়াও এশিয়ার বিশপদের সিনোদের পর "Ecclesia in Asia" নামে গুরুত্বপূর্ণ আর একটি দলিলও প্রকাশিত হয় যা এশিয়ার মণ্ডলী মম্পর্কে সম্যক ধারণা দেয়। প্রকৃতপক্ষে এফএবিসি এর প্রকাশনা পর্যাপ্ত যেগুলোর ওপর গবেষণা করে ইতোমধ্যে অনেকেই ডক্টরেট ডিগ্রিও লাভ করেছে।

৬। এশিয়ার মণ্ডলীগুলোর জন্য এফএবিসি এর অবদান

এশিয়া মহাদেশই হলো সকল ধর্মের জন্মভূমি। এখানে রয়েছে বিভিন্ন ধর্ম, অনেক ভিন্ন ভিন্ন কৃষ্টি-সংস্কৃতি এবং বিশ্বের অধিক সংখ্যক জনগোষ্ঠি। সবই অমূল্য সম্পদ। ঈশ্বরেরই মহাদান। তাই এই বৈচিত্র্যের লীলাভূমিতে একতা, মিলন ও ভ্রাতৃত্বের সংস্কৃতি গড়ে তুলতে এফএবিসি এর ভূমিকা অতুলনীয় এবং সত্যিই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রকৃত অর্থেই স্থানীয় মণ্ডলীর স্বপ্ন দেখতে, এই স্বপ্ন বাস্তবায়িন করতে এবং এশীয় মণ্ডলী হয়ে উঠতে ঐকান্তিক নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে এফএবিসি। মঙ্গলবাণী ঘোষণার লক্ষ্যই হলো স্থানীয় মণ্ডলী গড়ে তোলা। নতুন ভাবধারায় মণ্ডলী হওয়া এবং মণ্ডলীতে খ্রিস্টভক্তদের ভূমিকা পালনে ও সক্রিয় অংশগ্রহণে সহায়তাদানে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে এফএবিসি। মৌলিক খ্রিস্টীয় সমাজ গঠনে এবং এর মাধ্যমে অংশগ্রহণকারী মণ্ডলী হওয়ার অগ্রযাত্রায় এফএবিসি পথ প্রদর্শক। এশিয়ার বাস্তবতায় খ্রিস্টবিশ্বাসের দেহধারণে, শান্তি, সম্প্রীতি ও ভ্রাতৃত্বপূর্ণ সহাবস্থানের ক্ষেত্রে জীবন সংলাপের বিকল্প নেই। এই সত্যটি উপলব্ধি করে এফএবিসি ফলপ্রসূভাবে মঙ্গলবাণী প্রচারে ত্রিবিধ সংলাপের একটি সভ্যতা গড়ে তোলার উপর অত্যাধিক গুরুত্বারোপ করেছে। এই জীবন সংলাপ বিভিন্ন ধর্মীয় ঐতিহ্যের সাথে, বিভিন্ন কৃষ্টি-সংস্কৃতির সাথে এবং বিভিন্ন দীন-দরিদ্র মানুষের সাথে। এর সাথে হয়তো আজকের বাস্তবতায় আমাদের আর একটি সংলাপের কথা গুরুত্বের সাথেই চিন্তা করতে হবে, আর তা হলো সৃষ্টির সাথে সংলাপ। এইা বিষয়ে আমাদের গুরুতর ভাবনা ভাবতে হবে এবং এখনই সিদ্ধান্ত নিতে হবে। এশিয়ার বাস্তবতাগুলো ধ্যান করে এশীয় ঐশতত্ত্ব বৃদ্ধি এবং এশিয় ঐশতত্ত্বের পদ্ধতি সৃষ্টিতে এফএবিসি তাৎপর্যপূর্ণ অবদান রেখেছে যা আমাদের সম্মিলিতভাবে সামনে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। বিভিন্ন তথ্য সম্বলিত গবেষণামূলক বাস্তবধর্মী লেখা ও প্রকাশনার মধ্যদিয়ে এফএবিসি এশীয় মণ্ডলীর মানুষের দৃষ্টি খুলে দিয়েছে, মন-মানসিকতাকে আলোকিত করেছে এবং জ্ঞানভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করেছে। নীরবতা, ধ্যান, অনুধ্যান ও আধ্যাত্মিক অনুশীলনের মাধ্যমে এশিয় আধ্যাত্মিকতায় সমৃদ্ধ মানুষ হওয়ার পথ দেখিয়েছে এফএবিসি। তাছাড়াও ঐতিহাসিক, ঐশতাত্ত্বিক, পালকীয়, প্রৈরিতিক, ইত্যাদি বিভিন্ন ক্ষেত্রে ভূমিকা পালন করতে সবাইকেই আহ্বান জানাচ্ছে। শুধুমাত্র এশীয় মণ্ডলীগুলোর সাথেই নয়, বরং স্থানীয় মণ্ডলীর সাথে বিশ্বজনীন মণ্ডলীর যোগাযোগ স্থাপনে এফএবিসি সবার সামনে একটি আদর্শ স্থাপন করেছে। তাই বলা যায় এশিয় মণ্ডলীগুলোর জন্য এফএবিসি'র অবদান অনস্বীকার্য।

৭। বাংলাদেশ মণ্ডলীর ওপর এফএবিসি এর প্রভাব

বাংলাদেশ বিশপ সম্মিলনী এফএবিসি এর পূর্ণ সদস্য। বিধায়, এফএবিসি এর বিভিন্ন কার্যক্রমে সক্রিয় অংশগ্রহণের ফলে বাংলাদেশ মণ্ডলী প্রকৃত অর্থেই স্থানীয় ও অংশগ্রহণকারী মণ্ডলী হওয়ার ক্ষেত্রে নব প্রেরণা লাভ করেছে। এশিয়া তথা বাংলাাদেশের বহু ধর্ম, সমৃদ্ধ কৃষ্টি-সংস্কৃতি ও দীন-দরিদ্র জনগণের বাস্তব অবস্থা সম্পর্কে আরও গভীরভাবে সচেতন লাভ করেছে। বিশেষভাবে এফএবিসি এর সমৃদ্ধ প্রকাশনাসমূহ মেজর সেমিনারীতে অধ্যায়নের ফলে বাংলাদেশ মণ্ডলীর ভাবী যাজকদের গঠনে তাদের চিন্তা-চেতনায়, ধ্যানে-মননে ইতিবাচক প্রভাব পড়ছে। মণ্ডলীর এই ভাবী কর্ণধারেরা দেশীয় ভাবধারায় মণ্ডলীর গঠন ও সেবায় অনুপ্রাণিত হচ্ছে এবং মঙ্গলবাণী বিভিন্ন ধর্ম, কৃষ্টি-সংস্কৃতির জাতিগোষ্ঠীর মানুষের কাছে প্রচারে নতুন নতুন কৌশল অর্জন করছে। এফএবিসি এর বিভিন্ন দপ্তরগুলোর আদলে বাংলাদেশ ক্যাথলিক বিশপ সম্মিলনীও বিভিন্ন ক্ষেত্রে সেবাদানের জন্যে অনেকগুলো এপিসকপাল কমিশন গঠন করে সক্রিয়ভাবে কাজ করে যাচ্ছে। মণ্ডলীতে খ্রিস্টভক্তদের সক্রিয় অংশগ্রহণ বৃদ্ধির জন্য তাদের অনুপ্রাণিত করছে এবং সুযোগ সৃষ্টি করছে। বিশেষভাবে বাংলাদেশ মণ্ডলীর চিন্ত-চেতনা-ভাবনায় একটা নতুনত্ব এবং নবায়ন এসেছে। বাংলাদেশের বাস্তবতায় ঐশতাত্ত্বিক অনুধ্যান ও ঐশতত্ত্ব বৃদ্ধির প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।তাছাড়াও এফএবিসি গঠনের ফলে বাংলাদেশ মণ্ডলী এশিয়া পর্যায়ে নেতৃত্বে সক্রিয় অংশগ্রহণ করে অবদান রাখার ও বাংলাদেশ মণ্ডলীকে এশিয়া তথা বিশ্বে প্রতিনিধিত্ব কররা সুযোগ পচ্ছে। এই সবই বাংলাদেশ মণ্ডলীর উপর এফএবিসি এর ইতিবাচক প্রভাবই বটে।

৮। উপসংহার

এফএবিসি এশিয়ার মণ্ডলীগুলোর মধ্যে মিলন, একতা, সম্প্রীতি, সংহতি স্থাপন ও পারস্পরিক সহযোগিতা বৃদ্ধির একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। একসাথে পথচলার একটি প্রেরণা। এশিয়ার বিভিন্ন, ধর্ম, জনগণ, কৃষ্টি-সংস্কৃতি, ঐতিহ্য, সম্পদ ও ঐশ্বর্যকে জানার সুযোগ সৃষ্টিকারী। স্বকীয়, দেশীয়, স্থানীয় ও অংশগ্রহণকারী ম-লী হওয়ার পথে অন্তর্দৃষ্টি উম্মোচনকারী। জীবনের অবস্থা, পরিস্থিতি, বাস্তবতায়, কৃষ্টি-সংস্কৃতিতে ঈশ্বরের উপস্থিতি ও কার্যক্রম উপলব্ধি করার ও ঐশতাত্ত্বিক অনুধ্যান করার এবং মঙ্গলবাণী প্রচারের মাধ্যমে ঐশরাজ্য বিস্তারের ক্ষেত্রে নতুন পথের সন্ধানদাতা। তাই এই এফএবিসি সম্পর্কে জানা ও এফএবিসি এর লেখাসমূহ পাঠ করে জ্ঞান ভা-ার সমৃদ্ধ করা এবং চিন্তা-চেতনায় নবায়িত হয়ে স্থানীয় মণ্ডলী হয়ে উঠার ক্ষেত্রে সক্রিয় অংশগ্রহণ করা যাজক, ব্রতধারী-ব্রতধারিণী ও খ্রিস্টভক্ত হিসাবে আমাদের সকলেরই দায়িত্ব।

সহায়ক তথ্যসূত্রঃ

১। *Fr. Vimal Tirimanna ed.,A Brief History of FABC, FABC Paper No .139, 2013.*

২। *FABC: Statutes of the Federation of Asian Bishops' Conferences.*

সামাজিক মূল্যবোধ গঠনে যোগাযোগ মাধ্যম

ফাদার জয়ন্ত এস গমেজ

একজন মানুষের চরিত্র ও ব্যক্তিত্ব গঠনের পিছনে তিনটি প্রতিষ্ঠান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পালন করে আসছে। তিনটি প্রতিষ্ঠান হল– পরিবার, স্কুল এবং ধর্ম। ঐতিহ্যগতভাবেই এই তিনটি প্রতিষ্ঠান সামাজিক ও ধর্মীয় মূল্যবোধ গঠনে বড় ভূমিকা রাখছে। সামাজিক মূল্যবোধ হল– কিছু সামাজিক রীতি-নীতি যা সমাজের মানুষদের ভাল কিছু করতে প্রেরণা যোগায়। অন্যদিকে, ঐতিহ্য, কৃষ্টি, সংস্কৃতি যা মানুষকে দায়িত্বশীল নাগরিক হিসাবে গড়ে উঠতে এবং সমাজে গণমঙ্গল প্রতিষ্ঠায় প্রভাবিত করে–তাই হল সামাজিক মূল্যবোধ। যে মূল্যবোধ মানুষের মধ্যে ভাল-মন্দ বুঝার শক্তি সৃষ্টি ক'রে সমাজে কল্যাণ প্রতিষ্ঠা করে, তাই সামাজিক মূল্যবোধ।

সৃষ্টির শুরু থেকে মানুষ পারিবারিক ও সংঘবদ্ধ জীবন যাপন ক'রে আসছে। পরিবার বিশ্বের আদিমতম প্রতিষ্ঠান। পিতা-মাতা, অভিভাবকদের তত্ত্বধানে সন্তানরা পরিবারে গড়ে ওঠে। শিশুদের জীবন গঠন ও বিকাশে পরিবারের ভূমিকা অপরিসীম। পরিবারকে বলা হয় সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বিদ্যালয়, যেখানে মানব শিশু দেহ-মন-আত্মার মানবিক, বৈষয়িক ও আধ্যাত্মিক জীবনের বিকাশ ঘটে। ভাল-মন্দ, ন্যায়-অন্যায়, ধর্ম-অধর্ম, নৈতিকতা, মূল্যবোধ এসব বিষয়ে জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা লাভ করে। পরিবারের বিকল্প পরিবারই।

স্কুল, শিশুর আরেকটু বৃহত্তম পরিমণ্ডল, যেখানে সে অনেকের সঙ্গে মিলে-মিশে নিজেকে বিকশিত করার সুযোগ পায়। পুঁথিগত জ্ঞান, শিক্ষকদের আদর্শ, শিক্ষার্থীদের সহচার্য, সব মিলিয়ে শিশুর চরিত্র ও ব্যক্তিত্ব গঠনে স্কুলের ভূমিক যথেষ্ট শক্তিশালী।

ধর্ম মানুষকে নৈতিক জ্ঞান ও আধ্যাত্মিক দিয়ে শক্তিশালী করে তোলে। ধর্মীয় বিধি-বিধান, সৃষ্টিকর্তার প্রতি আনুগত্য, মানুষের প্রতি দায়িত্ব এসব তো ধর্মীয় মূল্যবোধ থেকে উৎসারিত। বিদ্যা অর্জনে পাণ্ডিত কিংবা বড় ডিগ্রি লাভ করলেই যে সমাজের মঙ্গল হবে এমনটা ভাবা অবান্তর, যদি না অর্জিত জ্ঞানকে মানব সমাজের কল্যাণে ব্যবহৃত করতে না পারি। অন্যভাবে বলা যেতে পারে, নৈতিক জ্ঞান ছাড়া অন্য জ্ঞান পূর্ণতা পায় না। সকল অর্জিত জ্ঞানকে নৈতিক শক্তি দ্বারা ব্যবহৃত করলে, সেখানে যে উন্নয়ন ঘটে, তা স্থিতিশীল হয়। ধর্ম মানুষকে এক করে তোলে। ভ্রাতৃত্ব, মিলন, সংহতি প্রতিষ্ঠা করে মানব কল্যাণ আনয়ন করে।

পরিবার, স্কুল ও ধর্মের যুক্ত প্রভাবের চেয়েও শক্তিলালী হয়ে গণমাধ্যম এখন মানব জীবনকে প্রভাবিত করছে। গণমাধ্যমের প্রভাব এতটাই শক্তিশালী যে, পরিবার যা বলছে, স্কুল যা শিক্ষা দিচ্ছে, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান যে প্রেরণা দিচ্ছে, তাকে ছাপিয়ে গণমাধ্যম মানুষদের সিদ্ধান্ত নিতে চাপ তৈরি করছে। গণমাধ্যমগুলোর প্রচার, বিজ্ঞাপন, বিপনন, সবকিছু এত রঙীন, এত বৈচিত্র্যময় যে, মানুষ সহজেই তার প্রতি আকর্ষিত হচ্ছে। পরিবার, স্কুল, ধর্ম যা বলছে– তার মধ্যে এক ধরণের ত্যাগস্বীকার, কষ্ট, দায়িত্বশীলতার আবেদন আছে। কিন্তু গণমাধ্যমে সবকিছু শর্টকাট, কম পরিশ্রমে, সহজলভ্য ও গ্যারান্টিযুক্তভাবে উপস্থাপন করছে, তা মানুষদের কাছে বেশি গ্রহণীয়তা পাচ্ছে।

পরিবার শিক্ষা দেয়, স্বামী-স্ত্রীর পরস্পরের প্রতি বিশ্বস্ত থাকা বাঞ্ছনীয়। স্কুলে শিক্ষকগণ একইভাবে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন। ধর্মীয় বিধানেও স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ককে পবিত্র, অবিচ্ছেদ্য ও মহান হিসাবে গণ্য করে। কিন্তু গণমাধ্যমে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক বিষয়ে সরাসরিভাবে নেতিবাচক কিছু না বললেও, তা অভিনয় করে দেখানো হচ্ছে বিভিন্ন সিরিয়াল কিংবা নাটকে, তাতে এটা স্পষ্ট যে, বিবাহ বিচ্ছেদ কোন ব্যাপারই না। বনিবনা না হলে, ছেড়ে দেওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ। এগুলো হরহামেশাই অতি রঙ্গিনভাবে, নাটকীয় ও আকর্ষণীয়ভাবে উপস্থাপন করা হচ্ছে, যা সরাসরি দর্শক-শ্রোতাদের প্রভাবিত করছে। এই প্রভাবটা অতি শক্তিশালী। এই যে শক্তিশালী প্রভাবটা, তা কিন্তু নির্ভর করছে নিয়ন্ত্রণ ও ব্যবহারকারীর ওপর। গণমাধ্যমগুলো পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হয় মানুষ দ্বারা। তাছাড়া, এগুলো নিয়ন্ত্রিত হওয়ার আন্তর্জাতিক, জাতীয় ও আঞ্চলিক বিধি-বিধান রয়েছে। খ্রিস্টমণ্ডলী সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমগুলোর বিষয়ে অত্যন্ত সজাগ এবং এ বিষয়ে বহু পূর্বেই কিছু কিছু দিক-নির্দেশনা দিয়েছেন।

সামাজিক যোগাযোগ-মাধ্যম বিষয়ক নির্দেশনামায় (Inter Mirifica) বলা হয়েছে: "যোগাযোগ মাধ্যমগুলোকে সঠিকভাবে ব্যবহার করার জন্য অত্যাবশ্যক হচ্ছে এগুলোর ব্যবহারকারীদের মধ্যে নৈতিক জ্ঞান এবং তারা যেন এ জ্ঞান বিশ্বস্তভাবে এসব মাধ্যমে ব্যবহার করে" *(ইন্তার মিরিফিকা-৪)*। গণমাধ্যমগুলো মানুষের কল্যাণের জন্য কাজ করে। তাছাড়া, সমাজের ভাল-মন্দ, ন্যায্যতা-অন্যায্যতা, অন্যায়-অবিচার, অসঙ্গতি সবকিছুর বস্তুনিষ্ঠ মূল্যায়নপূর্বক জনগণকে অবহিত কওে এবং জনসচেতনতা গড়ে তোলে উন্নয়ন কর্মকাণ্ডকে গতিশীল রাখে। কোন গণমাধ্যমই প্রকৃতিগতভাবে মন্দ নয়; উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে কিংবা ব্যবহারগুণে তা মন্দতা ছড়াতে পারে। "যা কিছু উত্তম বিষয়ের আদান-প্রদানকে বাধাগ্রস্ত করে এবং মন্দতার প্রসারকে সমর্থন করে, তা পরিত্যাজ্য" *(ইন্তার মিরিফিকা-৯)*। রাজনৈতিক কিংবা ব্যবসায়িক উদ্দেশে ব্যবহৃত হলে, তা-ও মানুষের ও সমাজের অভূত ক্ষতি করতে পারে।

গণমাধ্যমগুলোর প্রধান শক্তি হল স্বাধীনতা ও দায়িত্বশীলতা। স্বাধীনভাবে কাজ করতে না পারলে কোন মাধ্যমই বস্তুনিষ্ঠতা রক্ষা করতে পারেনা। স্বাধীনতার সঙ্গে দায়িত্বশীল হওয়া খুবই জরুরী। তথ্য যেমন মানুষ এক করে তোলে, তেমনি মানুষের মধ্যে মিলন ও ভ্রাতৃত্ববোধ গড়ে তোলে। তথ্যই শক্তি। বাধাহীনভাবে তথ্য পাবার অধিকার সকলেরই রয়েছে। "এই অধিকার তখনই বাস্তবায়িত হবে যখন যোগাযোগের বিষয়বস্তুকে সত্য ও ন্যায্যতা ও ভ্রাতৃপ্রেমের সীমানার মধ্যে থেকে পূর্ণাঙ্গ হয়। এর অর্থ হচ্ছে, সংবাদ সংগ্রহ ও প্রকাশের সময় নৈতিক বিধিবিধান এবং মানুষের বৈধ

অধিকার মর্যাদা সমুন্নত রাখতে হবে। নিছক জ্ঞান মানুষকে আত্মগর্বে ফাঁপিয়ে তোলে; 'ভালবাসাই মানুষকে গড়ে তোলে' (১ করি. ৮:১)।" "সকলকে বস্তুনিষ্ঠ নৈতিক মানদ-ের নিরঙ্কুশ শ্রেষ্ঠত্বকে অবশ্যই গ্রহণ করতে হবে। শিল্পকলা, যতই মহৎ হোক না কেন, বস্তুনিষ্ঠ নৈতিক মানদ-ের বাইরে কিছু নয়। নৈতিক মানদ-ই কেবল ঈশ্বরের বুদ্ধিবৃত্তিসম্পন্ন জীবন হিসেবে মানুষের সম্পূর্ণ সত্তাকে স্পর্শ করে। আর বুদ্ধিবৃত্তিসম্পন্ন জীবরূপে মানুষ একটি পারমার্থিক গন্তব্যের দিকে আহুত। এ নৈতিক মানদ-কে পূর্ণ ও বিশ্বস্তরূপে পালন করলে মানুষ পূর্ণ উৎকর্ষতা ও সুখের দিকে চালিত হয়" (ইন্তার মিরিফিকা: সামাজিক যোগাযোগ বিষয়ক নির্দেশনামা-৬)।

কাথলিক ম-লী প্রৈরিতিক কাজে গণমাধ্যমগুলো ব্যবহারের ক্ষেত্রে খুবিই ইতিবাচক। "ম-লীর সকল সদস্যদের সম্মিলিত প্রচেষ্টা গ্রহণ করা উচিৎ যাতে যেখানে ও যখন প্রয়োজন সেখানে তথনই যেন যথাসম্ভব অবিলম্বে ও বলিষ্ঠভাবে যোগাযোগ-মাধ্যমগুলো বিবিধ ধরনের প্রৈরিতিক কাজে ব্যবহৃত হয়। যে সকল প্রকল্প ক্ষতিকর বলে প্রমাণিত হতে পারে তাদের সেগুলোকে বাধা দেয়া উচিত। সে সব ক্ষেত্রে এমন করা উচিত যেখানে নৈতিক ও ধর্মীয় প্রগতির কারণে খুব জরুরিভাবে হস্তক্ষেপ প্রয়োজন হয়ে পড়ে" (ইন্তার মিরিফিকা-১৩)।

কাথলিক সামাজিক যোগাযোগ-মাধ্যমগুলোকে শতকরা একশ' ভাগ কাথলিক হওয়া বাঞ্ছনীয়। অনেক ক্ষেত্রে সরকারি-বেসরকারি অনেক গণমাধ্যমগুলো ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যকে প্রাধান্য দিতে গিয়ে নৈতিক, মানবিক ও গণমঙ্গলের বিষয়গুলোকে পাশ কাটিয়ে যায়। দ্বিতীয় ভাতিকান মহাসভা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে যে, "কাথলিক সংবাদপত্র, সাময়িকী, চলচ্চিত্র, রেডিও ও টেলিভিশন ষ্টেশন ও অনুষ্ঠানাদিকে পৃষ্ঠপোষকতা ও সহায়তা করণে তাদের দায়িত্ব রয়েছে। এসবের প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে সত্যের প্রচার ও রক্ষণ এবং খ্রিস্টীয় মূল্যবোধ সমাজে পরিব্যাপ্তকরণ। একই সঙ্গে কারিগরি ও অর্থনৈতিকভাবে সম্পদশালী সংস্থা ও ব্যক্তিদেরকে আহ্বান জানানো হচ্ছে বিশুদ্ধ সংস্কৃতি ও প্রৈরিতিক কর্মের সঙ্গে জড়িত যোগাযোগ-মাধ্যমগুলোকে যেন তারা উদারভাবে নিজেদের জ্ঞান ও সম্পদ দিয়ে সহায়তা দান করে" (ইন্তার মিরিফিকা-১৭)।

বাংলাদেশের বর্তমান প্রেক্ষিতে, জনসংখ্যার সবচেয়ে বড় অংশ হচ্ছে তরুণ প্রজন্ম। যাদেরকে বলা হচ্ছে ই-প্রজন্ম। এই ই-প্রজন্মের হাত ধরেই বাংলাদেশের বর্তমান আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের চাকা উর্ধ্বমুখী। এদের সম্পর্কে বলা হয়েছে: "যোগাযোগ-মাধ্যম ব্যবহারকারীদের মধ্যে বিশেষভাবে যারা তরুণ, তাদেরকে শিখতে হবে কি করে মিতাচার ও শৃংখলার সঙ্গে এসব মাধ্যম ব্যবহার করা যায়। তাদের উদ্দেশ্য হওয়া উচিত, তারা যা দেখে, শোনে ও পড়ে, তা যেন তারা পূর্ণভাবে বুঝতে পারে। এসব ব্যাপার নিয়ে নিজস্ব শিক্ষকবর্গ ও বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে আলোচনাপূর্বক তাদেরকে সঠিক সিদ্ধান্ত উপনীত হতে শিখতে হবে। অন্যদিকে, পিতা-মাতাদের স্মরণ রাখা কর্তব্য, যেসব বিনোদনমূলক অনুষ্ঠান ও প্রকাশনা ধর্মবিশ্বাস ও নৈতিকতাকে বিপদগ্রস্ত করতে পারে, সেগুলো যেন তাদের গৃহে প্রবেশ না করে এবং তাদের সন্তানগণ যেন অন্যত্র গিয়েও সেগুলোর সংস্পর্শে না আসতে পারে।" *(ইন্তার মিরিফিকা-১০)*।

আজকাল ডিজিটাল বিয়ে কিংবা ফেসবুক বিয়ে বলে একটা কথা বেশ প্রচলিত হয়ে উঠেছে। যুবক-যুবতীদের পারস্পরিক পরিচয় এবং পরিবর্তীতে তা পরিণয়ে এবং পারিবারিক জীবন গঠনে ফেসবুক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। ভার্চুয়াল রিয়েলিটিকে পুঁজি করে যে সম্পর্ক গড়ে উঠছে, তাতে যথেষ্ট ঝুঁকি ও সমস্যাও সৃষ্টি হচ্ছে। ভার্চুয়াল থেকে বাস্তবে নেমে আসলে দেখা যায় অনেক কিছু মেলাতে কষ্ট হয়। অনেক কিছু মিলে না। শুরু হয় আত্মদ্বন্দ্ব। অনেক সময় ফেরার পথ থাকে না। এ ধরণের সম্পর্ক পরিবর্তিতে ভেঙ্গে যায় কিংবা ঝুঁকিতে থাকে। ভার্চুয়াল জগতে প্রতারিত হওয়ার যথেষ্ট ঝুঁকি থাকে। এক্ষেত্রে গণমাধ্যমগুলো যেন সকল নৈতিক বিধি-বিধান যথার্থভাবে পালন করে সেদিকে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে। "আত্মার পক্ষে ক্ষতিকারক না হয়ে বরং উপকারী হতে হলে নৈতিক বিধি-বিধানকে অবশ্যই কঠোরভাবে পালন করতে হবে। -- যথার্থ সহায়তা নিয়ে নিজেদের বিবেককে পরিচালনা ও গঠন করার জন্য উপযুক্ত পদক্ষেপ নিতে হবে যাতে ক্ষতিকারক প্রভাব থেকে মুক্ত থেকে মঙ্গলজনক প্রভাব দ্বারা অধিকতর লাভবান হওয়া যায়" *(ইন্তার মিরিফিকা ৭ ও ৯)*।

দেশের সরকারের দায়িত্বও এক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। দেশের সরকার জনগণের সার্বিক কল্যাণ প্রতিষ্ঠায় প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। সুতরাং গণমাধ্যমগুলোর অপব্যবহার দ্বারা "জন-নৈতিকতা ও সামাজিক প্রগতি যেন গুরুতররূপে বিপদগ্রস্ত না হয়, সেদিকে নিরপেক্ষভাবে সতর্ক দৃষ্টি রাখাও সরকারের কর্তব্য" *(ইন্তার মিরিফিকা ১২)*।

নৈতিক মূল্যবোধ হল মানুষের চোখের মতো। দৃষ্টিশক্তি নষ্ট হয়ে গেলে ভাল-মন্দ বিচার করা যেমন সম্ভব নয়, তেমনি মানুষের মানবিক ও নৈতিক মূল্যবোধ যদি না থাকে, তবে ভালোর প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয় না। সকল গণমাধ্যমগুলো জাতীয় ও আন্তর্জাতিক নীতিমালা মেনে দায়িত্বশীলভাবে পরিচালিত হবে এমনটাই কাম্য। যারা গণমাধ্যমগুলো ব্যবহার করেন, তাদেরও লক্ষ্য রাখতে হবে যেন তা মানব কল্যাণে ব্যবহৃত হয়। তাতে যেন সর্বোচ্চ গণমঙ্গল প্রতিষ্ঠা পায়। গণমাধ্যমগুলো যেন পেশাদারিত্ব এবং নৈতিক মানদণ্ড বজায় রাখে এবং তা কখনো যেন মানব কল্যাণের সঙ্গে সংঘাতপূর্ণ না হয়। শৈল্পিক সৌন্দর্য, মানবিক মূল্যবোধ, মর্যাদা এবং মানুষের মৌলিক অধিকার সমন্বিতভাবে সুরক্ষিত হয় সেদিকে বিশেষ নজর রাখতে হবে। দরিদ্র, অসহায়, নির্যাতিত, প্রতিবন্ধী, সমাজের প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর স্বার্থকে প্রাধান্য দিয়ে, গণমঙ্গল প্রতিষ্ঠা করা আবশ্যক। এক্ষেত্রে সরকারের বিশেষ দায়িত্ব হবে– স্বাধীন ও নিরপেক্ষভাবে গণমাধ্যমগুলোকে দায়িত্ব পালন করতে দেয়া। নিজস্ব সংস্কৃতি, কৃষ্টি, ঐতিহ্য ও মূল্যবোধগুলোকে সুরক্ষা করা। প্রয়োজনে সুস্থ ধারার নাটক, চলচিত্র, শিল্প-সাহিত্য, সঙ্গীত ও দেশীয় সংস্কৃতির সুষ্ঠু বিকাশ ও সংরক্ষণে সরকারের বিশেষ পদক্ষেপ থাকা বাঞ্ছনীয়।

গণমাধ্যমগুলো তাদের নিজস্ব নীতিমালা, পেশাদারিত্ব, নৈতিক মূল্যবোধ দ্বারা দায়িত্বশীলভাবে পরিচালিত হলে সেখানে গণমঙ্গল নিশ্চিত হতে পারে। ব্যবহারকারীদেরও এ বিষয়ে যথেষ্ট সচেতন ও দায়িত্বশীলভাবে তা ব্যবহার করতে হবে। গণমাধ্যমের যে অভূতপূর্ব শক্তি, তা মানুষের সেবা ও কল্যাণে ইতিবাচকভাবে ব্যবহার করলে, তা সকলের জন্যই আশির্বাদ বয়ে আনবে॥

মণ্ডলীতে এক আদর্শ কর্ণধার আর্চবিশপ টি এ গাঙ্গুলী

ফাদার হিউবার্ট গমেজ

বাংলার পূর্বপুরুষদের দ্বারা শিক্ষণীয় যে প্রবাদগুলি রয়েছে তা বাঙালির জীবন পথ চলার পাথেয়। এর একটা প্রবাদ বাক্য হলো দাঁত থাকতে দাঁতের মর্যাদা বুঝে না। তেমনি আমার লেখায় আরেকটি হলো - গায়ে মানে না আপনি মোড়ল। আর্চবিশপ গাঙ্গুলীকে জীবিতকালে আমরা যেভাবে মূল্যায়ন করেছি, তার চেয়ে বেশি মূল্যায়ন করি তার তিরোধানে ও তার অবর্তমানে এই জগতে। জীবিতকালে আমরা বুঝিনি তিনি যে, একজন মহান পুরুষ সাধু ব্যক্তি। এখন তা বুঝতে পারি ও হাড়ে-হাড়ে উপলব্ধি করছি। তিনি চলে গিয়েও তিনি আছেন। তার মৃত্যুতেও নতুনভাবে জীবিত আমাদের অন্তরে হৃদয়ে। যারা তাকে দেখেনি তারাও তার বিষয় শুনে তাকে চিনতে পারছে।

কে কতুটুকু মানুষের কাছে বরণীয় তা বুঝা যায় তার সমাধিকালে। তাই সমাধিকালে তিনি মানুষকে বেশি কাঁদাতে পারেন তিনিই স্মরণীয় হয়ে থাকেন। জগতে এখনও মানুষ আছে যার মৃত্যুতে লোকে বলে, মরেছে; ভাল হয়েছে। শোনা যায় যে, অনেকে কুখ্যাত ব্যক্তির মৃত্যুতে মিষ্টি বিতরণ করে। স্মরণ করি আরেকটি প্রবাদ, বৃক্ষ তোমার নাম কি? ফলেই আমার পরিচয়। তার প্রতিটি মৃত্যুবার্ষিকীতে স্মরণসভা হয় বিভিন্ন জায়গায়। স্মৃতিচারণ করা হয় তার জীবনের অনেক মর্যাদা যা আমাদের জন্য আদর্শ ও অনুকরণীয়। এমনি ঘটনা আমারও রয়েছে যা এই লেখনীতে প্রকাশ করছি। ছোটবেলা ঠাকুরমা ও গুরুজনদের কাছে শুনেছি হাসনাবাদের কয়েকজন ফাদারদের মধ্যে তেতন নামে ফাদার আছেন। বয়স্ক গুরু ব্যক্তিগণ থিওটনিয়াস উচ্চারণ করতে না পেরে তেতন। সবার মুখেই শুনেছি শৈশবে তিনি ছিলেন সরল, নম্র, সাধাসিধে বুদ্ধিমান- সবই গুণাবলী; দুর্বলতার কোনো কিছু নয়। তা আজীবন তিনি রক্ষা করেছেন।

বড়াই করার মতো কোনো কিছু ছিল না শুধু নম্রতা-সরলতা ছাড়া। নম্রতা নিয়েই নীরবে বড়াই করেছিলেন কাজে-কর্মে কথায়-চিন্তায়। তিনি একজন পাপহর ব্যক্তি। অন্যের পাপ দোষ ত্রুটি অন্যায় তিনি নিজে বহন করতেন। কখনো অন্যকে ব্যথা দিতে পারতেন না। বরং নিজে ব্যাথা বহন করতেন। তার মধ্যে ছিল না কোন কলুষ-এর ছায়া। সর্বদা ছিলেন হাসি-খুশী। তাকে আমি দেখেছি তার অভিষেক অনুষ্ঠান থেকে বাংলার প্রথম বিশপরূপে।

১৯৬০ খ্রিস্টাব্দে অক্টোবর মাসের ৭ তারিখে তার অভিষেক অনুষ্ঠান হয়। আমি তখন অষ্টম শ্রেণিতে বান্দুরা সেমিনারীতে। রেক্টর ফাদার ইভান্স। আমরা ৫৬ জন সেমিনারীয়ান রিজার্ভ করা গয়না, নৌকায় সারারাত যাত্রা করে সকালে সদরঘাট পৌঁছি। সদরঘাট থেকে পায়ে হেঁটে গুলিস্তান

পর্যন্ত যাই। সবার পরনে ছিল ধূতি ও সাদা শার্ট। নবাবপুরের রোডে প্রসেশন করে যাচ্ছিলাম। দোকানদার, পথচারীগণ এ দৃশ্য দেখে মনে হয়েছিল তারা হতভম্ব। মনে করি, এরূপ সাদা বকের হেঁটে-হেঁটে যাবার দৃশ্য আগে দেখেনি। দুইজন সেমিনারীয়ান আসতে পারেনি। কারণ বাংলার প্রথম বিশপের মহা আনন্দে আমরা রমনা যাবার আগে কীর্তন করেছিলাম উন্মাদের মত। একজন সেমিনারীয়ান মহাআবেগে নাচার সময় লম্ফ-জম্ফ দিতে গিয়ে একটি পা ভেঙে ফেলেছিল। কথাটা কিন্তু নব অভিষিক্ত বিশপের কানে যখন গেল, তখন তিনি অন্যান্য প্রোগ্রাম বাদ দিয়ে সেমিনারীয়ানকে দেখতে এলেন। সঙ্গে নিয়ে এসেছিলেন কেক, রুটি, বিস্কুট। তার পিঠে হাত বুলিয়ে আদর করে পরে প্রার্থনা করেছিলেন সুস্থতার জন্যে। চিকিৎসার জন্যে রেক্টরকে টাকা দিলেন। তার কেক খাওয়া দেখে একজন বলেছিল, আমারও পা যদি ভাঙতো ভালো হতো। অন্যের প্রতি যে সহমর্তিতায় তার হৃদয় পূর্ণ ছিল প্রথমেই তা বিকশিত হলো। এ স্থলে মনে হয় এই মহান বিশপ ছাড়া অন্যেরা কি এভাবে দৌড়ে আসত? তিনি তাই হলেন অভিষিক্ত ভালবাসায়, তার অন্তর সরলতায় ছিল রিক্ত, আচরণে ছিলেন দরিদ্র-দীন, রিক্ত।

এর বেশ কিছু দিন পর, যখন তিনি প্রথমে এলেন সেমিনারীতে তাকে আমরা অভিনন্দন পত্র ও মালা দিয়ে বরণ করে নিলাম। গলায় মালাটি মাত্র দুই সেকেন্ড রেখে, রেক্টরকে তিনি পড়িয়ে দিলেন। এই প্রথম চোখে পড়ল এরূপ ঘটনা। তা দেখে আনন্দের মধ্যেও বুঝতে পারলাম, অন্যের প্রতি তার কত শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা। আদর্শ প্রদর্শনের দৃশ্যে আমরা স্বীকৃতিস্বরূপ হাতে তালি দিয়েছিলাম। আর্চবিশপ গ্রেনারকে আমরা সবাই বাঘের মত ভয় পেতাম কিন্তু এই বিনম্র মেষকে দেখে আমাদের হৃদয় আনন্দে ভরে ওঠেছিল। আমাদের সঙ্গে খুবই অন্তরঙ্গভাবে আলাপের সময়ও উপলব্ধি করেছিলাম তার বিনম্র ও মধুময় কণ্ঠ। তার পদ নিয়ে তিনি গর্ব দেখাননি, আর উচ্চ-বাচ্য করেননি কখনও প্রথম থেকেই দেখালেন, তিনি প্রভুর সমর্পিত এক মেষপালক পরবর্তীতেও লক্ষ্য করেছি তার হৃদয় ছিল ছলনাহীন, মহানতা ও উদারতায়পূর্ণ। তাকে পেয়েছিলাম সেমিনারীয়ান হিসেবে।

১৯৬৫ খ্রিস্টাব্দে পাক-ভারত যুদ্ধের সময়, পাকিস্তান সরকার সকল বিদেশী নাগরিককে তথা ফাদার ব্রাদার-সিস্টারদের আদেশ দিয়েছিল, তারা যেন বর্ডার মিশনগুলি ছেড়ে ঢাকা শহরে নিরাপদে থাকতে পারেন। বর্ডার মিশনগুলি বিদেশী ফাদারগণ ছাড়া শূন্য হয়ে গেল, কারণ স্থানীয় দেশীয় ফাদার-সিস্টারদের সংখ্যা ছিল হাতে গোনা কয়েকজন। প্রায় সবই ছিলেন বিদেশী। যুদ্ধ কবে শেষ হবে তা জানা ছিল না বিধায় কেউ-কেউ চলে গেলেন ব্যাংককে ছুটে কাটাতে। মিশনগুলি শূন্যতায় খাঁ-খাঁ করছিল, খ্রিস্টভক্তগণ নিরাশ ও আতঙ্কিত। এ অবস্থায়, আর্চবিশপ গ্রেনার সিদ্ধান্ত নিলেন যে দেশীয় সেমিনারীয়ানদের শীঘ্র ফাদার হতে হবে। সেপ্টেম্বর মাসে যখন যুদ্ধ বাঁধল, তখন আমি নটরডেম কলেজে মাত্র এক মাস বিএ ভর্তি হলাম। আমার মত বিভিন্ন ডাইয়োসিস থেকে সব মিলিয়ে আমরা ৯ জন। আর্চবিশপ গ্রেনার আদেশ দিলেন, আমাদের ডেকে শীঘ্রই আমাদের বিএ পড়া বাদ দিয়ে করাচী যেতে হবে মেজর সেমিনারীতে। না বলার উপায় ছিল না। যেহেতু আমি একা আর্চডাইয়োসিস থেকে, বিশপ গাঙ্গুলী তখন নিজের ঘরে ডেকে নিয়ে আমাকে অনেক উপদেশ দিয়ে সাহস

যোগাতে লাগলেন। বললেন, পূর্ব পাকিস্তান মণ্ডলীর জন্য দেশীয় পুরোহিতের অনেক প্রয়োজন। তিনি আমাকে অভয় ও আশীর্বাদ দিয়ে বললেন, ভালো থেকো আর শীঘ্রই ফাদার হয়ে আসো। তার এই উপদেশ ও আশীর্বাদ হয়ে উঠেছিল শক্তি যা আমার পুরোহিত হবার বাসনাকে আরও করেছিল উদীপ্ত।

যখন আমি সাত বছর পর ফিরে আসলাম স্বাধীন বাংলাদেশে সঙ্গে ছিলেন ফাদার জ্যোতি, তিনি আমাদের দুজনকে সাদরে অভিনন্দন জানিয়ে বললেন, তোমাদের পুরোহিতরূপে দেখতে পেয়ে কত ভালো লাগে। এক সঙ্গে চা খেলাম, এর মাঝে কত গল্প-কাহিনী কেচ্ছা ইত্যাদি। যা জোর দিয়ে তিনি বললেন, আমাদের বাংলাদেশ মণ্ডলীর জন্য ধর্মপ্রদেশীয় যাজক অনেক প্রয়োজন। সেই সাথে বললেন, তোমরা যে ধর্মপল্লীতেই থাক না কেন, যুবকদের উদ্বুদ্ধ কর পুরোহিত হতে। সে বাক্যটি স্মরণ করে অত্যান্ত একজন দরিদ্র মান্দি ছেলে, নিজের পোষ্য পুত্ররূপে প্রায় কুড়ি বছর পালন করে তাকে সহায়তা করেছি। সে এখন ময়মনসিংহ ধর্মপ্রদেশের একজন পুরোহিত হয়েছে। আর্চবিশপ গাঙ্গুলীর আকুল অনুরোধ আমি ফেলে দেইনি। তার অনুপ্রেরণায় আমার পুরোহিত জীবন সার্থক, এখন আমার সেই পালিত ছেলে হলো ফাদার তরুণ বনোয়ারী। বর্তমানে বারোমারি মিশনে সেবাদান করছে। এখন বুঝতে পারি, তার এই আকুল অনুরোধ বাস্তবায়ন করা সব পুরোহিতের প্রতি প্রযোজ্য, অন্তত প্রচেষ্টায় যেন কেউ পিছিয়ে না যায়।

মানুষের জীবনে ঘটে যাওয়া বিভিন্ন ঘটনার মধ্যদিয়েই তার চরিত্র বৈশিষ্ট্য উপরন্ত আদর্শ, অনাদর্শ প্রকাশিত হয়। এভাবে আমার এ লেখা নিতে চেষ্টা করেছি তার আদর্শকে প্রকাশ করতে, ঘটে যাওয়া ঘটনার মধ্যদিয়ে। আমার পুরোহিত জীবনে তার সঙ্গে সম্পর্কিত ঘটে যাওয়া ঘটনাগুলি ব্যক্ত করতে গিয়ে মনে পড়ে, আমার কর্মক্ষেত্রে নিয়োগের বিষয়। প্রথমে আমাকে গারো দেশের বালুচড়া মিশনে নিয়োগ দিয়ে বললেন, গারো দেশে কাজ করা যেমন কষ্ট, তেমনি সেখানে আছে আনন্দ। বাধ্যতার ব্রত পালন করে চলে গেলাম গারোদেশের বালুচড়া মিশনে। প্রথম মিশন গারোদেশে ১৯৭৪ খ্রিস্টাব্দে। মিশন দেশে পূর্বে শেষ তিনটি গ্রাম ৩০ কিলোমিটার দূরে তৎকালীন সময় সিলেট জেলায়। এক মাস পরেই সেই দূরবর্তী গ্রামগুলিতে গেলাম পায়ে হেঁটে। রাতে গ্রামগুলিতে থাকতে হতো, কোন সময় রাতের আশ্রয় স্থান ছিল গোয়াল ঘর। এদিকে আমি ও ক্যাটেখিস্ট মাস্টার, অন্যদিকে গরু। গারোদেশে তিন মাস কাটালাম। দেখলাম সবই কষ্ট। তাহলে আনন্দ কোথায়? আনন্দের সন্ধান পোলাম না। মনে-মনে স্থির করলাম এত কষ্টে, গারোদেশে থাকতে পারব না। আর্চবিশপ গাঙ্গুলীকে গিয়ে বলব, আমাকে বরং ভাওয়াল বা আঠারোগ্রাম অঞ্চলের একটি ধর্মপল্লীতে পাঠান। আত্মীয়স্বজনের কাছেও বললাম বাড়ি গিয়ে তারা তো মহাখুশী।

চিঠির মাধ্যমে জানিয়েছিলাম। তাই প্রায় সবকিছু নিয়ে পাল-পুরোহিতের কাছে কথাটা বলে, ঢাকায় রওনা হলাম। বর্ষাকাল তখন। দশ মাইল খাল-বিল সাঁতরিয়ে আরও আট মাইল বাসে চড়ে বাড়িয়া এসে ট্রেনে উঠলাম। ঢাকায় এলাম। আর্চবিশপ হাউজে তখন কমপাউন্ড ওয়াল ছিল না। শুধু রডের বেড়া সামনে যা এখন মা মারীয়ার গ্রটোর চারিদিকে দেওয়া হয়েছে। গেটে ঢোকার সময় দেখলাম, আর্চবিশপ উপরে দাঁড়িয়ে কার সঙ্গে যেন কথা বলছেন। আমাকে দেখলেন, আমি গেট দিয়ে দুই-তিন ব্যাগ নিয়ে ঢুকছি। তিনি আমাকে দেখে নিচে নেমে এসে আমার একটি ব্যাগ নিজ হাতে নিয়ে আসলেন, আমি দুটো। সোজা উপরে পার্লারে নিয়ে গেলেন। কুশলাদি অনেক কিছু জিজ্ঞেসা করতে-করতে তিনি নিজ হাতে আমার জন্য কফি বানিয়ে দিলেন, বিস্কুট খুঁজে বের করে খেতে দিলেন আর কথা বলতে লাগলেন। তার হাতের কফি খেয়ে আমার সব কথা ভুলে গেলাম। অবাক হতে লাগলাম, নিজ হাতে বানিয়ে খাওয়ালেন। যে উদ্দেশে এসেছি তা আর বলা হলো না। কফির কাপের মধ্যে তিনি তার সমস্ত ভালোবাসা আদর-যত্ন ঢেলে দিলেন। কি যাদুমন্ত্র দিয়ে যে কফি বানালেন, আমার বক্তব্য সব ভুলে গেলাম তার ভালোবাসার যাদুমন্ত্রে। আর বলাই হলো না। বাড়িতে কয়েকদিন কাটিয়ে ফিরলাম আর্চবিশপ হাউজে। রওনা হলাম আবার গারোদেশে। আমার সঙ্গে তিনি গেট পর্যন্ত আসলেন। আমি রিক্সায় উঠে কমলাপুর স্টেশনে রওনা হলাম। আমার দিকে চেয়ে রইলেন যতক্ষণ পর্যন্ত আমি অদৃশ্য না হলাম। আমার অন্তর তার ভালোবাসার ছোঁয়ায় এক নতুন উদ্দীপনায় ভরে গেল। বালুচড়া গিয়ে পৌছালাম। এখন দেখলাম যে, সব আনন্দ, কোন কষ্ট নেই। তার ভালোবাসার যাদুমন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে, তখন হৃদয়ে শুধু আনন্দ উপভোগ করলাম। সেই থেকে গারো দেশে কাজ করার ভাল লাগা। এতো ভালো লাগা যে, আমি ত্রিশ বছর গারোদেশে কাজ করলাম একটানা। বোধহয় বাঙালি ফাদার যারা গারোদেশে কাজ করেছেন, তাদের মধ্যে আমি সবচেয়ে বেশি গারোদেশে থেকেছি। তার সেদিনের নিজ হাতে কফি বানানোর কথা জীবনে ভুলিনি, ভুলব না। এখন প্রশ্ন করি, কে তার মত এরূপ আদর্শ কর্ণধার হতে পারে। মৃত্যুর সংবাদ পেয়ে মনে হয়েছিল অনাথ হয়ে গেলাম। ভাবলাম, কে আমাকে তার মত ভালোবাসবে? তার ভালো দিয়ে মানুষকে তিনি আপন করে নিতেন। আকর্ষণ করতেন তার ভালোবাসার অন্তর দিয়ে। আর একটি ঘটনার কথা বলি। এক সপ্তাহের জন্য ছুটি নিয়ে গারোদেশ থেকে ঢাকায় এলাম। আর্চবিশপ বললেন, চলো আমার সঙ্গে, নাগরী যাই। রাজী হলাম। তখন পূবাইলের ব্রিজ হয়নি। পারাপারের জন্য গুদারা ছিল। নিজে ড্রাইভ করলেন সঙ্গে ড্রাইভারও ছিল। গাড়ি এক জায়গায় নিরাপদে রাখা হলো। ড্রাইভার পাহারাদার। দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার পর কিছু বিশ্রাম করে রওনা হলাম পৌছালাম শীঘ্র, তখন যানযটের বালাই ছিল না। যে কথাটা বললেই নয়, সেটা হল গাড়ি থেকে নেমে পূবাইল নদী দিয়ে নৌকায় নাগরী পৌছলাম। তার পায়ের সমস্যা ছিল। নৌকায় পাটাতনের তক্তা খুলে পা নিচুতে রাখলেন। একটু আরাম করে বসার জন্য তিনি আমাকে বললেন, তুমি আমার পিঠে তোমার পিঠ লাগিয়ে বস, আমার বসতে আরাম হবে। তাই করলাম। কিন্তু বিষয়টা যাত্রাকালে উল্লেখ্য যে, তিনি আমাকে এভাবে বসে থেকে অন্তত ত্রিশবার কিছুক্ষণ পর-পর জিজ্ঞেস করলেন, তোমার পিঠ ব্যাথ্যা করছে না তো? তোমার কষ্ট হচ্ছে না তো? প্রত্যেকবার বলেছি, আমিও প্রভু আরামে বসেছি। মানুষকে ব্যাথা না দেওয়ার পরিচয় তা ছিল তার চিরচরিত চরিত্রের একটা অংশ। জীবনে কাউকে তিনি ব্যথা না দিয়ে সেই ব্যথা নিজে বহন করতেন। এভাবে আমি তার মধ্যে ক্রুশবিদ্ধ যিশুকে স্পষ্ট দেখেছি।

আর একটি ঘটনা। তিনি যে কথাবার্তায় অন্যের প্রতি শ্রদ্ধাবান ছিলেন, কাউকে ছোট করে দেখতেন না, মর্যাদা দিতেন, ক্ষুদ্র এ ঘটনা তা আমাদের কাছে ব্যক্ত করছে। যাওয়ার ঘন্টা পড়ল। আমরা কয়েকজন দোতলা থেকে আসছিলাম খাবার ঘরে যাওয়ার জন্যে। সাক্ষাৎপ্রার্থী একজন পরিচিত খ্রিস্টভক্ত তাকে যিশুতে প্রণাম জানালেন, তিনি জিজ্ঞাসা করলেন ভাল আছেন তো? বাচ্চা-কাচ্চারা কেমন আছে? দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে তার সঙ্গে কথা বলে খাবার ঘরে প্রবেশ করলেন। আমরা আগেই খাবার ঘরে এসে বসে পড়েছি। যখন তিনি প্রবেশ করলেন খাবার ঘরে আমাদের পরে, তার মুখখানি একটু বিষন্ন দেখলাম, যেন ভীষণ চিন্তিত। কিছুক্ষণ পর বলতে লাগলেন, আমি লোকটার সঙ্গে আলাপ করতে গিয়ে বাচ্চা-কাচ্চা কেমন আছে জিজ্ঞেস করলাম। আমাদের কয়েকজন বলে উঠল, এটা তো আমরাও জিজ্ঞেস করে থাকি পরিচিত কারো সঙ্গে দেখা হলে। তিনি আমাদের কথায় সন্তুষ্ট হলেন না। বুঝলাম এ কথা বলে একটা শুধু ভুল নয়, দোষ করে ফেলেছেন। তিনি এই দোষ শুধরাতে ছটফট করছিলেন। খাওয়া রেখে তিনি পরিবেশক কর্মীকে

বললেন, দেখতো একজন লোক আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন, তাকে ডাক। কর্মীভাই দৌড়ে গিয়ে তাকে ডেকে আনলেন। ইতোমধ্যে, আর্চবিশপ এগিয়ে গেলেন তার সঙ্গে দেখা করতে। তিনি বলে আসলেন, আপনার বাড়িতে আমি যাব আগামীকাল, আপনার সন্তানদের দেখে আসব, অনেক দিন হয় আপনার বাড়ি যাই না। লোকটা মহাখুশী। আর্চবিশপও তার বড় দোষ সংশোধন করতে পেরে আনন্দিত হয়ে খেতে শুরু করলেন। কথাটা আমাদের কাছে বললেন। আমরা তো খেয়ে গেলাম খাবার সময় এইতো এই মহান আদর্শ কর্ণধারের মহান বিবেকের পরিচয়। আমরা তা শুধু চিন্তা করলাম। আমরা তাহলে অনেক দোষ করেছি অন্যের সঙ্গে কথাবার্তায়। আমরাও এভাবে কথাবার্তায় সাবধান থাকব। এ ক্ষুদ্র ঘটনায় যেটা আমাদের কাছে কিছুই না, তার কাছে বড় কোন দোষ। তাই দেখেছি, অন্যের প্রতি কথাবার্তায় তিনি এত সাবধান হতেন যা আমাদের কাছে অনুসরণীয়। এই আদর্শ কর্ণধারের আচরণ-বিচরণ আমরা যারা তার সংস্পর্শে এসেছি সবাই অনুসরণ করেছি। পাঠক ভাইবোনেরা যারা পড়ছেন, আপনাদের এ ক্ষুদ্র ঘটনা কি অনুসরণীয় নয়? যদিও এ ক্ষুদ্র বিষয়টি তোয়াক্কা করি না। তাই বলতে ইচ্ছা হয়, এই আদর্শ কর্ণধার আমাদের প্রত্যেকের জীবনে এক অনির্বাণ আলো যা আমাদের জীবনকে আলোকিত করে। তাই আমার চিন্তাধারায় তিনি জীবিতকালেই স্বর্গের সিড়ি বেয়ে ঊর্ধ্বে গমনকারী আরোহী ছিলেন।

আমাদেরও তার আদর্শ ঊর্ধ্বগামী যাত্রায় স্বর্গের সিড়ি বেয়ে যেতে তিনি মৃত্যুর পরও যেন হাত ধরে টেনে নিয়ে যাচ্ছেন, আমরা যারা তাকে অনুসরণ করতে চাই। তাই তার আদর্শ আমাদের জীবনে প্রতিষ্ঠিত হোক জীবনের ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র ঘটনায়। তার প্রার্থনার জীবন ছিল আর্কষণীয়। আমরা কি কাউকে দেখেছি যিনি পবিত্র ঘন্টা করেন? তাকে দেখিছি। অনেকে লক্ষ্য করেছেন, অনেকে নয়। সকালের নাস্তায় খ্রিস্টযাগের পর তিনি উপস্থিত থেকে সুপ্রভাতের মিশন খ্রিস্টযাগে উপস্থিত থাকতেন। কথাবার্তায় আলোচনায় সবার সঙ্গলাভ করতেন। সবশেষে সোজা গির্জাঘরে তিনি এক ঘন্টা কাটাতেন। এই প্রতিদিনের পবিত্র ঘন্টা ছিল তার জীবনের আধ্যাত্মিক এক খাদ্য ও শক্তি। দিনের আরম্ভেই ঈশ্বরের চরণে নিজেকে সুষ্ঠুভাবে নিবেদন করতেন। আমার ব্যক্তিগত চিন্তায় আমি এমন ভাবি, এত কাজ ও এত দায়িত্বের ভারে তিনি এই এক ঘন্টা সময় ঈশ্বরের জন্য পূর্ণভাবে ব্যয় করতেন। যা ছিল তার আত্মার খোরাক। এর বিপরীতে চিন্তা আসে আমরা তো প্রতিদিন দেহের খোরাক নিয়ে ব্যস্ত। প্রভুর প্রার্থনায় যে আমরা আবৃত্তি করি, আমাদের দৈনিক অন্ন অদ্য আমাদিগকে দাও তিনি প্রচারও করতেন এবং বাস্তবে দেখিয়ে দিয়েছেন, এই দৈনিক অন্ন শুধু দেহের জন্য নয়, আত্মার জন্যও। তার এ কথা কি আমরা নিত্য উপলব্ধি করতে পারি? মনে হয় যদি উপলব্ধি করতে পারতাম তাহলে আমরাও তার মত প্রতিদিন পবিত্র ঘন্টা করতাম। এ তো আমাদের চোখের সামনে। আমাদের চোখের আড়ালে তিনি কত সময় আত্মার অন্নের জন্য নীরবে প্রার্থনা করতেন তা কে জানে? আদর্শ সর্বদা অনুকরণীয়, অনাদর্শ বর্জনীয়।

শুনেছি তিনি বাংলাদেশে খ্রিস্টাব্দের মধ্যে প্রথম পিএইচডিধারী ব্যক্তি। তা নিয়ে তিনি কোনদিন বড়াই করেননি। তার কথাবার্তায়, লেখায় তা প্রকাশিত হয়েছে। এত বড়মাপের ব্যক্তি অথচ শিশুর মত যা যিশুর বাক্যটি আমাদের বার-বার স্মরণ করায়, তোমরা যদি এ শিশুদের মত না হও, তাহলে স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ করতে পারবে না। তাই যিশুর কথায়ই তিনি স্বর্গরাজ্যে সগৌরবে প্রবেশ করেছেন।

তার নম্রতা, সরলতার আর একটি আদর্শের বিষয় বলেছেন, যা প্রতিবেশী পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। এখন থেকে বিশপকে প্রভু-টভু বলা উচিত হবে না। কেননা আমাদের তো এক প্রভু আছেন। উপরন্তু আমরা এখন আর্চবিশপকে, বাংলা করলে, মহাপ্রভু বলে ডাকি। তিনি এটা চাননি। মণ্ডলীর ধারায় এটি একটি সম্মানিত খেতাব যা আমরা বাদ দিতে বোধহয় পারব না। সে চিন্তাই আমাদের মাথায় আসে না। কিন্তু তিনি নম্রতার প্রতীক হয়ে জীবনের এই স্বাক্ষরে আমাদের উদ্বুদ্ধ করলেও তার আদর্শের এই বড় দিকটা একেবারে এড়িয়ে গিয়েছি। যিশুর কথা শুনে অনেকে যেমন বলেছিলেন, তার এখন মাথা ঠিক নেই। যারা মর্যাদা, সম্মান লাভে লালায়িত, ক্ষুধার্তবোধ করি তাদেরও এরকম ব্যঙমা। হয়তো তিনি ভেবেছিলেন, বিশপকে প্রভু বললে, যিশুকে আমরা প্রভু বলি, তাতে যিশুকে খাটো করা হয়। এ নিয়ে অনেকদিন অনেক আলোচনা হয়েছিল। চলমান অভ্যাসকে কি আমরা থামাতে পারি? কিন্তু এ আদর্শ কর্ণধার চেয়েছিলেন, আমরা যেন তা থামাই। আর্চবিশপকে শুধু আর্চবিশপ বললেই চলে। বাস্তবে মহান আদর্শের কর্ণধারের মহান চিন্তা খ্রিস্টভক্তগণ বা আমরা মেনে নেইনি। তিনি যিশুর শিক্ষা আমাদের জীবনে বাস্তবায়িত করতে সাহসী ও অস্বাভাবিক চিন্তা আমাদের মাথায় ঢুকিয়ে দিয়েছিলেন। তা হলো যে, যে নিজেকে ছোট করে, তাকে বড় করা হবে, নত করে, তাকে উন্নত করা হবে। মনে হচ্ছে, আমাদের অভ্যাসটা গড়ে ওঠেনি। মণ্ডলী যিশুর চেয়ে বড়। কেননা অনেকাংশ আমরা যিশুর কথা, যা চিরন্তন বাণী, তা ডাস্টবিনে ফেলে দিচ্ছি। এভাবে আরো আমাদের কুঅভ্যাসের রীতি প্রমাণ করে, আমরা সর্বদা, গরীবদের বাদ দিয়ে নিমন্ত্রণ করি ধনী নামী-দামী ব্যক্তিদের।

যিশুর কথা ডাস্টবিনে তথা মণ্ডলী ডাস্টবিনে ফেলে দেই সেটা হলো, তোমরা যখন কাউকে নিমন্ত্রণ করো, সব ল্যাংড়া, খোড়া, অন্ধদেরও করো কারণ তাদের কাছ থেকে তোমরা প্রতিদান প্রত্যাশা কর না। প্রতিদান পাবে স্বর্গে, পিতার কাছ থেকে। এ চিরন্তন বাণীগুলি ডাস্টবিনে ফেলে দেওয়া থেকে এ মন্দ অভ্যাস থেকে কে আমাদের মুক্ত করবে। আর্চবিশপ গাঙ্গুলীকে, প্রায়ই তিনি গবীর-দুঃখীদের বাড়িতে যেতেন নিমন্ত্রণ ছাড়াই, তাদের দরিদ্রতার সহমর্মিতায়। তাকে দেখে আমার মনে হয়েছে, তিনি দরিদ্রতার ব্রত অক্ষরে-অক্ষরে পালন করেছেন। দরিদ্রতা পালনে ধর্মীয় সংঘে ব্রত নেওয়া হয়, কিন্তু দরিদ্রতা পালন একটা বোকামি, এমনিভাবে এ দরিদ্রতার উপহাস দেখা যায়, অনেকের ব্রতীয় জীবনে, কারণ এ ভোগ-বিলাসের জীবনে ব্রত নিয়ে, জীবন থেকে দরিদ্রতা নির্বাসিত হতে দেখা যায়। উপরন্তু দরিদ্রতার ব্রত না নিয়েও জোরালোভাবে পালন করেছে যারা অভাবী, অনাহারে দিন কাটাচ্ছে। গোপনে তিনি দান করতেন। তার ডান হাত যে কি করছে, বাম হাতকে জানতে দেননি। মঙ্গলসমাচারের কথা তিনি আক্ষরিকভাবে জীবনে পালন করতেন।

রাগ যে কি, তা তার চারিত্রিক অভিধানে ছিল না, আমরা রাগের অভ্যাস থামাতে পারি না। তিনি বহু চেষ্টা করেও রাগ করতে পারতেন না। একদিন একজন তার সমবয়স্ক সঙ্গী পুরোহিত তাকে তামাশা করে বলেছিলেন, খাওয়ার পর আপনি কাঁচা পেঁয়াজ খাবেন তখন রাগ করতে পারবেন। আমি মনে করি, এই পুরোহিতের কথার বিপরীতে যে, দৈনিক তিনি এক কেজি পেঁয়াজ খেলেও রাগ করা শিখতেন না। একবার আমি তার সঙ্গে যাচ্ছিলাম রমনা থেকে লক্ষ্মীবাজার গির্জায় একটি অনুষ্ঠানে মোটরগাড়িতে। তিনি নিজে ড্রাইভ করছিলেন। নবাবপুর রোডে যাবার সময় হঠাৎ একটা রিক্সা কোন সিগন্যাল না দিয়ে গাড়ির সামনে থেকে টার্ন নিলো হঠাৎ ব্রেক করলেন। শুধু তিনি চশমার ফাঁক দিয়ে রিক্সাওয়ালার দিকে তাকালেন এবং বললেন, ব্রেক না দিলে তো বিপদ হতো। অন্যের বেলায় হলে এরূপ ঘটনায় গালিগালাজ বেরিয়ে আসতো। কিন্তু রাগ তার কাছে হেরে যেত।

তার চারিত্রিক জীবনের এমন বৈশিষ্ট্যতায় তিনি সাধু ব্যক্তি। প্রশাসনে যে জটিলতা কলা, কৌশল ডিপ্লোমেসি এসব তাকে আক্রান্ত করতে পারত না অন্যের বিপরীতে। শিশুসুলভ মন নিয়ে কি তা করা যায়? কতো

কর্মে তিনি ছিলেন ক্লান্ত-শ্রান্ত, ব্যবহারে ধীর, স্থির, শান্ত। সবার জন্যে তার অন্তর খেলা ছিল।

যদিও মহান ব্যক্তি আর্চবিশপ গাঙ্গুলী তার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের ফলে এবং তার আন্তরিক নম্রতা ও সরলতার গুণে প্রদীপ্ত ও সুশোভিত ছিলেন। যার ফলে তিনি দক্ষ প্রশাসক হতে পারেননি, তবুও তিনি মাঝে-মাঝে যে, একা সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তারও প্রমাণ রয়েছেন যা তার স্মরনিকায় প্রকাশ। ঘটনাটি হলো মেরিনল ফাদারগণ সংখ্যায় পাঁচজন যখন বাংলাদেশে এলেন তখন তারা প্রকাশ করলেন যে, তাদের মধ্যে অন্তত দুইজন অখ্রিস্টানের মধ্যে কাজ করবেন, যা ছিল ১৯৭০ এর দশকের প্রথম দিকে। তাদের শর্ত ছিল, দুজনকে যদি অখ্রিস্টানদের মধ্যে কাজ করতে দেওয়া না হয়, তাহলে সবাই বাংলাদেশ থেকে চলে যাবে। আর্চবিশপ গাঙ্গুলী উপদেষ্টাদের ডাকলেন, মেরিনল ফাদারদের কথা বললেন, শর্তটা বললেন। উপদেষ্টা সবাই তৎকালে প্রধান ছিলেন মন্সিনয়র পিটার (রাঙামাটিয়ার) ও ফাদার পল। তাদের কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে প্রকাশ করলেন সবাই যদি তারা মিশনে কাজ করে, তা না হলে তারা বাংলাদেশ ত্যাগ করুক তাদের প্রয়োজন নেই। কিন্তু আর্চবিশপ গাঙ্গুলী সবার বিপরীতে বললেন, আমাকে আপনারা সময় দিন, আমি প্রার্থনা করব ঈশ্বরের ইচ্ছা কি তা যেন আমি উপলব্ধি করতে পারি। সিদ্ধান্ত নিতে ধ্যান-সাধনা প্রার্থনায় মগ্ন হলেন। দশদিন প্রার্থনা ধ্যান করার পর তিনি প্রকাশ করলেন, ঈশ্বর চান তারা যেন অখ্রিস্টানদের মাঝেও কাজ করেন, যেহেতু আমরা সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম ভাইদের সঙ্গে বাস করছি। তাদের মঙ্গলবাণীর জীবন সাক্ষ্যও ধর্মপ্রচার মুসলিম ভাইদের কাছে। সব উপদেষ্টার বিপরীতে তিনি তাদের সবাইকে অবাক করে দিয়ে বললেন, তারা ৫ জনই কাজ করবে, বাংলাদেশে আর একটা দিক হলো মিশনারীগণ উদ্যোগ নিয়ে বাংলাদেশে এসেছেন, কঠিন সমস্যার সময়ে তাদের কীভাবে তাড়িয়ে দিবেন, সে ব্যাথা তো তার নিজের ব্যাথা হবে, উপদেষ্টার কোনো ব্যথাই লাগবে না। আবার উপদেষ্টাদের ডাক দিয়ে বললেন, ঈশ্বর চান তারা যেন বাংলাদেশে কাজ করেন।

সদা পরকল্যাণকামী এই আদর্শ কর্ণধারের বিচক্ষণতার দেখা যাচ্ছে, চল্লিশ বছরের উর্ধ্বে ২জন মেরীনল ফাদার এখনও রয়ে গেছেন বাংলাদেশে কর্মরত। তারা হলেন, ফাদার ম্যারকেন উলস্ ও ববভাই যিনি চরম দরিদ্রতায় নিজে পাকিয়ে ৮২ বছর বসয়েও সাইকেল চালিয়ে মুসলমান রোগীদের নিজ খরচে চিকিৎসা করান। তিনি থাকেন ছোট্ট ডেরাঘরে। বর্তমানে আছে চাঁদপুরে। ফাদার ডগলাস মুসলমানদের মাঝে কাজ করে মারা গিয়েছেন। এই সাধু ব্যক্তির বিষয় লিখতে কত কিছুই না মনে পড়ে। সবগুলি ভালো দিক। কোন মন্দতা তাকে স্পর্শ করতে পারে নাই। ইংরেজী বাংলায় দুটি ভাষায় কথা ও উচ্চারণ ছিল ব্যতিক্রমধর্মী। তার উপদেশে মানুষ হতো মুগ্ধ। তা ছিল জ্ঞানগর্ভ।

তার অকাল মৃত্যুতে শুধুই ভাবি, মাত্র ৫৭ বছর বয়সে, এত আগে কেন তিনি মারা গেলেন। তার প্রশাসনিক দুর্বলতায় আক্রান্ত ছিলেন, রাগ করে কাউকে কিছু বলতে পারতেন না। দুর্বলতার সুযোগে অনেকে তার সমালোচনাও করত। আমার ব্যক্তিগত চিন্তাধারায় আমি মনে করি, তিনি যদি বিশপ না হতেন, তাহলে তিনি আরোও বেশিদিন বেঁচে থাকতেন। যে ব্যক্তি রাগ করতে জানেননি, যে ব্যক্তি অন্যকে কঠিন কথা বলে শাসন করতে জানেননি, তিরস্কার করতে জানেননি, কাউকে ধমক দিতে পারেননি বরং ধমকের প্রতিধ্বনি বুমরাং হয়ে তারই কাছে নীরবে ফিরে আসত, সে ব্যক্তি দক্ষ প্রশাসক হবে কি করে? প্রশাসনে সাধুগিরি খাটে না। শুনেছি এক প্রবীণ পুরোহিতের কাছ থেকে আর্চবিশপ গ্রেনারের যারা পরামর্শদাতাগণ এক বৈঠকে বিশপ হবার সম্ভাবনাময় দুই ব্যক্তির নাম প্রস্তাব করেছিলেন। তাকে এবং ফাদার যাকব ভুরাকে। আজ ভাবি ফাদার ভুরা যদি বিশপ হতেন, তার বদলে বিশপ গাঙ্গুলী কিন্তু আরও দীর্ঘদিন বেঁচে থাকতেন, বিশপ না হয়ে। মৃত্যুর দুদিন আগে একটা বড় গুরুত্বপূর্ণ সম্মেলন হয়েছিল, নটরডেম কলেজে। সেখানে সাধারণ খ্রিস্টভক্তগণ ও ফাদারগণ উপস্থিত ছিলেন। ধর্মপ্রদেশে বিভিন্ন সমস্যার কথা উল্লেখ করে কোন-কোন ক্ষেত্রে তার অদক্ষ প্রশাসনকে দোষারোপ করা হয়। এ সমস্ত সমালোচনা, অভিযোগ নীরবে মেনে নিয়েছিলেন। এক অব্যক্ত বেদনা তাকে এমনিভাবে আক্রান্ত করেছিল, কেননা তিনি সকল ব্যথা-বেদনা অন্তরে বহন করেছিলেন যা ছিল অসহনীয়। কেননা তিনি এ সমস্ত কারো সঙ্গে সহভাগিতা করতেন না। এরূপ পুঞ্জিভূত ব্যথা-বেদনায় মানসিকভাবে আক্রান্ত হয়ে শেষ হার্ট ফেইল করলেন ও অকাল মৃত্যুবরণ করলেন।

তাই তিনি হলেন সাক্ষ্যমর। দু'ধরনের সাক্ষ্যমর আছে। একটি রক্তিম সাক্ষ্যমর, যারা ধর্মের কারনে প্রাণ দেয়, তাদের হত্যা করা হয়, অন্যটা শুভ্র সাক্ষ্যমর যা তিনি ছিলেন। নিজের জীবন অকাতরে বিলিয়ে গেছেন। তিনি খ্রিস্টমণ্ডলীর জন্য আলোকিত আলো। আলোকবর্তিকা হয়ে তিনি অসংখ্য মানুষের হৃদয়ে স্থান করে নিয়েছেন। যা লক্ষ্য করা যায় তার মৃত্যুদিবসে স্মরণে খ্রিস্টযাগ ও সম্মিলনীতে। সর্বদা আমার চিন্তায়, তার জীবনকে আলেকিত আলো, যা আমাদের জীবনকে আলোকিত করেছে। কিন্তু এও লক্ষ্য করা যায় যে, মণ্ডলীর কিছু ধর্মীয় ব্যক্তিদের আলো আছে, কিন্তু সে আলো অন্ধকারাছন্ন আলো। তার আদর্শ জীবন আমাদের দুর্বলতাকে স্মরণ করিয়ে দেয়, লজ্জায় ফেলে। পরিশেষে বলি, একটা কথা আছে ফুল ফুটুক বা না ফুটুক আজই বসন্ত। তেমনিভাবে, তাকে এখন রোম সাধু বলে ঘোষণা করুক বা না করুক তিনি আমাদের কাছে একতার সাধু ব্যক্তি ও সাধু। আমরা তাকে জানি, চিনি ও মানি॥

Remembering you Papa with Love & Respect

Mr. Rock Solomon Gomes
Born: 18 January 1940
Died: 23 November 2014

"Gone but never forgotten"

Man is mortal but the love for them is immortal.
Papa, though you are not present here with all of us
But your memory is stored on our mind.
Love is how you stay alive.
Even after you are gone.

Rest peacefully in heaven
We always Love & miss you papa......

Bereaved family.
Wife: Mrs. Maria Sandhya Gomes
Son: Tushar
Son & Daughter-in-law: Paul & Wendy
Daughter & Son-in-law: Mony & Amitabh
Granddaughter: Alana Maria Yosenn Gomes

যাজকতন্ত্র ও পোপ ফ্রান্সিস

যেরোম ডি'কস্তা

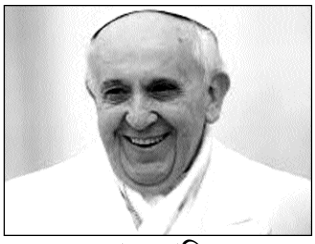

পোপ ফ্রান্সিস

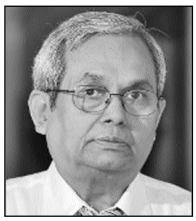

ভূমিকা: বাইবেলের পুরাতন নিয়মে ইহুদী যাজকশ্রেণি আবির্ভূত হয়েছে ধর্মীয় সেবাদানের জন্য। ক্রমান্বয়ে যাজকগণ অধিকতর ক্ষমতা, প্রতিপত্তি ও অর্থকড়ি পেয়ে এমন এক গোষ্ঠীতে পরিণত হয়েছিলেন যে, তারা সাধারণ ইহুদীদের থেকে নিজেদেরকে উচ্চতর পর্যায়ের ভাবতেন। এভাবে ইহুদী যাজকতন্ত্র বহু অকল্যাণ বয়ে এনেছে।

খ্রিস্টধর্মের প্রবর্তক যিশুখ্রিস্ট একজন ইহুদী ছিলেন। তিনি এ যাজকতন্ত্রেরই সমালোচনা করে গেছেন। তিনি বলেছেন: "হায় হায় আপনারা শাস্ত্রীরা আর ফরিসীরা, যত ভণ্ডের দল। একজনকেও যদি ইহুদী ধর্মে আনা যায়, সেই আশায় আপনারা তো জলস্থলে চারিদিকেই ঘুরে বেড়াচ্ছেন; অথচ কেউ একবার ইহুদী ধর্মগ্রহণ করলে আপনারা তাকে তো আপনাদের চেয়েও নরকে যাবার দ্বিগুণ যোগ্যই করে তুলেছেন" *(মথি ২৩:১৫)*। যিশু কর্তৃক ইহুদী যাজকতন্ত্রের আরও সমালোচনা ও নিন্দা সম্পর্কে জানার জন্য বাইবেলের নতুন নিয়মের মথি ২৩: ১৬-৩৬ পড়ুন।

বাইবেলের নতুন নিয়মে যিশুখ্রিস্টের অনুসারীদের মধ্যে নতুন করে যাজকশ্রেণি আবির্ভূত হয়েছে, যাদেরকে আমরা খ্রিস্টান বা কাথলিক যাজক বলে থাকি। কাথলিক মণ্ডলীর যাজকশ্রেণিও ক্রমান্বয়ে কাথলিক রাজা ও সম্রাটদের সমর্থন ও পৃষ্ঠপোষকতা পেয়ে শক্ত রূপ ধারণ করে প্রচুর প্রভাব-প্রতিপত্তি লাভ করেছে। এ নতুন যাজকশ্রেণির যাজকতন্ত্রও কাথলিক মণ্ডলীতে প্রচুর অকল্যাণ বয়ে এনেছে।

দক্ষিণ আমেরিকার আর্জেন্টিনার কার্ডিনাল হর্হে মারিও বের্গোলিও ২০১৩ খ্রিস্টাব্দের ১৩ মার্চ পোপ ফ্রান্সিস হিসেবে নির্বাচিত হয়েই কাথলিক মণ্ডলীর যাজকতন্ত্রের বিরুদ্ধে কাজ করছেন। তিনি তাঁর কথা ও কাজে দেখাতে চাচ্ছেন যে, যাজকতন্ত্র যিশুখ্রিস্টের শিক্ষা-বিরোধী আচরণ এবং কাথলিক মণ্ডলীর জন্য এ আচরণ ক্ষতিকর। এ আচরণ যাজকশ্রেণি ও সাধারণ খ্রিস্টভক্তদের মধ্যে উচ্চ দেওয়ালসম বাঁধার সৃষ্টি করেছে। এ আচরণ যথাসম্ভব ত্যাগ করে যাজক-বিশপদেরকে শাসকের বদলে সেবক (সেবাকারী) হওয়া উচিত।

যাজকতন্ত্র কি?

'যাজকতন্ত্র' বা 'পুরোহিততন্ত্র'কে ইংরেজীতে বলে Clericalism। এটিকে 'যাজকীয় শাসন' বা 'যাজক-ব্যবস্থা'ও বলা যেতে পারে। Clericalism এসেছে ইংরেজী Cleric শব্দটি থেকে, যার অর্থ 'যাজক' বা 'ধর্মীয় নেতা।' কাথলিক মণ্ডলীতে যাজকশ্রেণিভুক্ত ব্যক্তিগণ হচ্ছেন ডিকন, যাজক (পুরোহিত), বিশপ, আর্চবিশপ, কার্ডিনাল ও পোপ। ইংরেজি মেরিয়াম-ওয়েব্স্টার অভিধানে Clericalism-এর সংজ্ঞা হচ্ছে: "ধর্মীয় যাজকশ্রেণির ক্ষমতা ধরে রাখার অথবা ক্ষমতা বৃদ্ধি করার একটি নীতি।"

জেজুইট ফাদার মাইকেল কেলী এসজে ২০১৪ খ্রিস্টাব্দের ২ মে তাঁর একটি লেখায় বলেছেন: "আমি অবশ্য যাজকতন্ত্রের কথা বলছি। এটি হচ্ছে স্বার্থপরতার এমন একটি চর্চা যা যাজকদের মধ্যকার আধিপত্যবাদী বা প্রভুত্বকারী মনোভাব এবং নিজেদের আত্মরক্ষামূলক গোপনীয়তাকে ধরে রাখে। যাজকদের এ মনোভাবটি পেশাজীবী উকিল, ডাক্তার, সরকারী আমলা ও সেনাবাহিনীর অফিসারদের মনোভাবেরই অনুরূপ।"

২০১৪ খ্রিস্টাব্দের ১৩ জানুয়ারি তাঁরই একটি ব্লগ লেখায় তিনি বলেন: "সত্যিকার যাজকতন্ত্র হচ্ছে এমন একটি ব্যতিক্রম ও বিপথগামিতা যে, এটি অন্যের, বিশেষত: কাথলিক মণ্ডলীর অযাজকীয় ব্যক্তিদের, প্রতি ঘৃণা ও অসম্মানের জন্ম দেয়। ফলে সত্যিকার যাজকতন্ত্র প্রকাশ পায় যখন একজন ডিকন, যাজক ও বিশপ তাঁর আওতাধীন মেষপালের ওপর একটি প্রভুত্বকারী মনোভাব পোষণ করেন। তিনি বিশ্বাস করেন তিনি তাদের থেকে আরও 'উত্তম' – আধ্যাত্মিকভাবে, বুদ্ধিগতভাবে, অথবা অন্য কোনভাবে। যাজকতন্ত্র অযাজক ব্যক্তিদের [সাধারণ খ্রিস্টভক্তদের] ওপর পৃষ্ঠপোষকতা দেখায় এবং অযথা তাদেরকে সমালোচনা করে ছোট করে। যাজকতন্ত্র চায় অন্যকে সেবাদানের বদলে যাজকরা নিজেরাই যেন অধিকতর সুযোগ-সুবিধা লাভ করতে পারেন।"

পোপ ফ্রান্সিস ২০১৩ খ্রিস্টাব্দের ১ অক্টোবর ইতালির 'লা রিপাবলিকা' পত্রিকার একটি সাক্ষাৎকারে বলেন: "খ্রিস্টধর্মে যাজকতন্ত্রের কোন স্থান থাকা উচিত নয়। সাধু পৌল ছিলেন প্রথম ব্যক্তি যিনি অইহুদী, পৌত্তলিক, অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের সঙ্গে মিশেছেন, বাণীপ্রচার করেছেন–তিনিই প্রথম ব্যক্তি যিনি এটি আমাদের শিখিয়ে গেছেন।"

পোপ ফ্রান্সিস পুনরায় ২০১৪ খ্রিস্টাব্দের ৫ নভেম্বর জনসাধারণের কাছে সাক্ষাৎদান অনুষ্ঠানে বলেন, "দুঃখ হয় যখন তুমি একটি লোককে দেখ, যিনি যাজকীয় বা বিশপীয় পদ লাভের চেষ্টা করেন এবং তা পাবার জন্য এত এত পরিশ্রম করেন। কিন্তু একদিন ঐ পদ পেয়ে তিনি সেবাদানের বদলে ময়ূরপাখীর মত জমকালো পোশাক পরে ঘুরে বেড়ান–শুধু নিজের অসার দম্ভকে বজায় রাখার জন্য।"

পোপ ফ্রান্সিস ২০১৬ খ্রিস্টাব্দের ১৩ ডিসেম্বর ভাতিকানে 'কাসা সান্তা মার্তা' নামক যাজক–বিশপদের অতিথি–ভবনে উৎসর্গীকৃত খ্রিস্টযাগে প্রদত্ত উপদেশে ভাতিকানে কর্মরত বেশ কিছু কার্ডিনাল, বিশপ, যাজক ও খ্রিস্টভক্তের উপস্থিতিতে বলেন: "কাথলিক মণ্ডলীতে যাজকতন্ত্রের এমন একটি ভাব আছে যে, যাজকগণ নিজেদেরকে অযাজকদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ ভাবেন; তাঁরা নিজেদেরকে কাথলিক জনগণ থেকে পৃথক বা দূরে রাখেন। যাজকগণ এসব লোকদের সর্বদা বলে থাকেন, 'এটি এমনভাবে করতে হবে এবং, তোমরা – এখান থেকে চলে যাও!' এমন ব্যাপারটি ঘটে যখন ঐ যাজকের কষ্টভোগী মানুষের–অর্থাৎ দরিদ্র, অসুস্থ ও কারাবন্দী লোকদের–কথা শোনার সময় নেই। যাজকতন্ত্রের মন্দতা সত্যিকারভাবে খুবই দুঃখজনক ব্যাপার; এটি হচ্ছে প্রাচীন মন্দতারই নতুন একটি রূপ। কিন্তু, এক্ষেত্রে এ মন্দতার শিকার হচ্ছে একই ধরনের লোক–অর্থাৎ দরিদ্র এবং সাধাসিধে ও নম্র ব্যক্তিবর্গ, যারা প্রভুর [যিশুর] অপেক্ষায় আছে।"

যুক্তরাষ্ট্রের আইওয়া অঙ্গরাজ্যের ড্যাভেন্পোর্ট ধর্মপ্রদেশের বিশপ টমাস জিনকুলা 'দা ক্যাথলিক ম্যাসেঞ্জার' নামক ধর্মপ্রদেশীয় পত্রিকার ২০১৮ খ্রিস্টাব্দের ২০ সেপ্টেম্বর সংখ্যায় লিখেন: "যাজকতন্ত্র হচ্ছে যাজকদের কার্যাবলীর একটি বাড়াবাড়ি রূপ, যা সাধারণ খ্রিস্টভক্তদের ক্ষতির কারণ। যাজকদের চর্চায় যাজকদেরকে উচ্চাসনে রাখা হয়, আর খ্রিস্টভক্তরা থাকেন তাঁদের

প্রতি অতিমাত্রায় সম্মান প্রদর্শনকারী এবং অনুগত। পোপ ফ্রান্সিস বলেন যে, শুধু যাজকগণই যাজকতন্ত্রকে লালন-পালন করেন না, সাধারণ খ্রিস্টভক্তগণও নিজেদের আচরণ দিয়ে তা জোরদার করেন।"

যাজকতন্ত্রের উত্থান ও ক্রমবিকাশ: বাইবেলের নতুন নিয়মের অন্তর্ভুক্ত মঙ্গলসমাচারে দেখি যিশুখ্রিস্ট তাঁর ১২ জন শিষ্যকে হাতে-কলমে তিন বছরের ট্রেনিং দেন এবং তাঁদের নিয়ে 'মণ্ডলী' (সমাজ) গঠন করেন। শিষ্যদের অধিকাংশই ছিলেন অতি দরিদ্র, নম্র ও অশিক্ষিত– মাত্র গুটি কয়েকজন ছিলেন স্বল্পশিক্ষিত। যিশু কোন ধনী বা উচ্চশিক্ষিতদের নেননি। তিনি চেয়েছেন এমন এটি 'মণ্ডলী' বা সমাজ গঠন করতে যেখানে ঈশ্বর প্রকৃতভাবে ভক্তি-ভালোবাসা পাবেন এবং তাঁর নামে মণ্ডলীর সভ্য-সভ্যাগণ পৃথিবীব্যাপী মঙ্গলবাণী প্রচার করবেন এবং মানুষের কল্যাণ করে যাবেন।

তাঁর শিষ্যদের কাছে যিশুর কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা ছিল নিম্নরূপ:

১। শাসনের বদলে সেবাদান উত্তম, (বিস্তৃত জানার জন্য বাইবেলের মঙ্গলসমাচারে *মথি ২০: ২৫-২৮ পড়ুন)*।

২। শিশুর মত সহজ-সরল হওয়া *(মথি ১৮:৩)*।

৩। দীনদরিদ্র ও ক্ষুধার্ত হওয়া *(লুক ৬:২০-২১)*।

৪। অন্তরে দীন, বিনয়ী, দয়ালু ও ধর্মনিষ্ঠ হওয়া *(মথি ৫:৩-১২)*।

৫। একই সঙ্গে ঈশ্বর ও অর্থ-সম্পদের সেবা করা যায় না *(মথি ৬: ২৪)*।

৬। বেহিসাবী কথা বলা অন্যায় *(মথি ১২:৩৬)*।

৭। লোক-দেখানো প্রার্থনা করা এক ধরনের ভণ্ডামী *(মথি ৬:৫ এবং মথি ১৫:৮)*।

৮। ধন-সম্পদে আসক্তি ঐশরাজ্যে প্রবেশের জন্য বাধাজনক *(লুক ১৮:২৪-২৫; মথি ৬:১৯)*

৯। যিশুর শিষ্য হতে হলে ধন-সম্পদ ত্যাগ করতে হবে *(লুক ১৪:৩৩; মথি ১৯:২১, ২৯-৩০)*

১০। ইহুদী ধর্মশাস্ত্রবিদ (শাস্ত্রী) এবং আইনবিদদের (ফরিসিদের) অহঙ্কার ও ভণ্ডামি সম্পর্কে যিশুর সাবধানবাণী *(মথি ২৩: ২-৭)*।

১১। যিশুকে সেবা করার অর্থ তাঁর শিক্ষা পালন করা *(যোহন ১২:২৬)*।

১২। সমস্ত মন-প্রাণ ও অন্তর দিয়ে ঈশ্বরকে ভালোবাসা এবং নিজের মত প্রতিবেশীদেরও ভালোবাসা উচিত *(মার্ক ১২:২৯-৩১)*।

১৩। ঈশ্বরের নামে ইহুদী ধর্মীয় নেতাদের মিথ্যাকথন এবং ভণ্ড আচরণ সম্পর্কে যিশুর ধিক্কার ও সতর্কবাণী *(মথি ২৩:১-৩৯; লুক ১১:৩৭-৫৪)*।

১৪। পৃথিবীর সর্বত্র গিয়ে মঙ্গলবাণী প্রচার ও লোকদের দীক্ষাস্নাত করার নির্দেশ *(মার্ক ১৬:১৫; মথি ২৮:১৮-২০)*।

যিশুর স্বর্গারোহণ ও শিষ্যদের ওপর পবিত্র আত্মার আবতরণের পর দেখি শিষ্যগণ ও তাঁদের সহযোগিবর্গ মঙ্গলবাণী প্রচারুদ্দেশে ক্রমান্বয়ে বিভিন্ন এলাকা ও দেশে ছড়িয়ে পড়েন।

তৎকালে পৌত্তলিক রোমানগণ ইউরোপ ও পশ্চিম এশিয়ায় তাদের সাম্রাজ্য শাসন করতেন। নতুন আবির্ভূত খ্রিস্টধর্ম ছিল রোমানদের পৌত্তলিকতার সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী। খ্রিস্টীয় ৬৪ অব্দ থেকে ৩১৩ অব্দ পর্যন্ত প্রায়শঃ খ্রিস্টানদের ওপর অত্যাচার নেমে এসেছে। ধর্মীয় এ অত্যাচারের ফলে বহু খ্রিস্টান নতুন ধর্মের স্বপক্ষে প্রাণ দিয়েছেন, কেউ-কেউ খ্রিস্টধর্ম ত্যাগ করে পুরানো ধর্মে ফিরে গেছেন।

রোম-সম্রাট কন্সটেনটাইন খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করে ৩১৩ খ্রিস্টাব্দে খ্রিস্টধর্মকে তাঁর সামাজ্যে বৈধ করেন এবং সবধরনের ধর্মীয় অত্যাচারও বন্ধ করেন। ৩৮০ খ্রিস্টাব্দে সম্রাট ১ম থিওদোসিউস খ্রিস্টধর্মকে তাঁর সাম্রাজ্যের রাষ্ট্রধর্মের মর্যাদা দেন। এ অবস্থা জার্মান রাজপুত্র ওডোভাকার কর্তৃক ৪৭৬ খ্রিস্টাব্দে পশ্চিমা রোমান সাম্রাজ্যের পতন ঘটানো পর্যন্ত বজায় থাকে এবং ১৪৫৩ খ্রিস্টাব্দে অটোমান সুলতানের হাতে কন্সটান্টিনোপলের পতনের সময় পর্যন্ত প্রাচ্যের রোমান সাম্রাজ্যে বজায় থাকে।

রোমান সম্রাট ও অন্যান্য রাজ-রাজরাদের পূর্ণ পৃষ্ঠপোষণ, সমর্থন, এবং আর্থিক ও বৈষয়িক সুবিধাদি লাভ করার পূর্ব পর্যন্ত যাজক-বিশপগণ খুবই সাধারণ জীবন যাপন করতেন, তাঁরা সাধারণ খ্রিস্টভক্তদের সঙ্গে একই কাতারে থেকে বাণীপ্রচার ও ধর্ম পালন করতেন–প্রয়োজনে, অত্যাচার-নির্যাতন সহ্য করে ধর্মের জন্য প্রাণ বিসর্জনও দিতেন।

কিন্তু রোম-সম্রাটের মন পরিবর্তন ও খ্রিস্টধর্মগ্রহণের পর এবং তারও কিছুকাল পর খ্রিস্টধর্মকে রাষ্ট্রীয় ধর্মের মর্যাদা দেওয়ায় যাজক-বিশপগণ নানা ধরনের সুযোগ-সুবিধা, সমর্থন, উচ্চপদ, ও পৃষ্ঠপোষকতা পেতে থাকেন। তাঁদের ক্ষমতাও প্রভাব দ্রুত গতিতে বৃদ্ধি পেতে থাকে। রাষ্ট্রীয় উচ্চ-কর্মচারীদের পদ, সম্মান ও ক্ষমতার সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলার জন্য যাজক-বিশপগণও নিজেদের পদ, সম্মান ও ক্ষমতা বৃদ্ধি করে চলতে থাকেন।

ফলে, স্বাভাবিকভাবেই সাধারণ খ্রিস্টভক্তদের অবস্থান ক্রমান্বয়ে দূরে সরতে থাকে। যাজকশ্রেণি ও খ্রিস্টভক্তদের মধ্যকার শ্রেণিভেদ বৃদ্ধি পেতে থাকে। পশ্চিমা রোমান সাম্রাজ্যের পতনের পর যাজকশ্রেণি আরও ক্ষমতাধর হন বিভিন্ন দেশ ও সমাজে নেতৃত্ব দেবার জন্য। খ্রিস্টীয় ৮০০ খ্রিস্টাব্দে পোপ ৩য় লিও শার্লামেনকে পবিত্র রোমান সাম্রাজ্যের সম্রাট হিসেবে ঘোষণা দেন এবং তাঁর মাথায় রাজমুকুট পরিয়ে দিয়ে তাঁকে সর্বাত্মক সমর্থন দান করেন। এরপর কাথলিক মণ্ডলীতে ধারণা সৃষ্টি হয় যে, পোপের কাছ থেকে রাজমুকুট না পেয়ে কেউ পশ্চিম ইউরোপে সম্রাট হতে পারবেন না।

তারপর যুক্তি দেখানো হতো যে, এ পৃথিবীতে যিশুখ্রিস্টের প্রতিনিধি হিসেবে পোপগণ সম্পূর্ণ কাথলিক মণ্ডলীর পালক ও প্রধান। সংক্ষেপে বলা যায়, "পোপ ঐশক্ষমতা বলে কাথলিকদের আত্মার যত্নাদির ব্যাপারে সর্বাত্মক, পূর্ণাঙ্গ, আশু এবং বিশ্বজনীন ক্ষমতার অধিকারী"।

এভাবেই যাজকতন্ত্র কাথলিক মণ্ডলীতে তার এক স্থায়ী আসন গেড়ে বসেছে সেবাদান, দরিদ্রতা, অন্তরের সরলতা, দীনতা-বিনয়-দয়া-ধর্মনিষ্ঠতা, ধন-সম্পদ পরিত্যাগ, অহংকার ও ভণ্ডামী ত্যাগ, ধর্মীয় ব্যক্তি হিসেবে মিথ্যাকথন ও ভণ্ডামী ত্যাগ, সমস্ত মন-প্রাণ-অন্তর দিয়ে ঈশ্বর ও প্রতিবেশীদেরকে ভালোবাসা, এবং সর্বত্র গিয়ে মঙ্গলবাণী প্রচার সম্পর্কে যিশুখ্রিস্টের স্পষ্ট শিক্ষা উপেক্ষা করে।

দ্বিতীয় ভাতিকান মহাসভা ও যাজকতন্ত্র : দ্বিতীয় ভাতিকান মহাসভার (১৯৬২-১৯৬৫ খ্রিস্টাব্দে) পূর্ব পর্যন্ত কাথলিক মণ্ডলীতে যাজকবর্গ (ডিকন-যাজক (পুরোহিত-বিশপ-আর্চবিশপ-কার্ডিনাল-পোপ) ছিলেন উচ্চশ্রেণির লোক, সাধারণ খ্রিস্টভক্তগণ ছিলেন নিম্নশ্রেণির। যাজকশ্রেণি সব আদেশ-নির্দেশ দেবেন, খ্রিস্টভক্তগণ কোন দ্বিধা বা প্রতিবাদ না করে বাধ্য ছেলের মত তা শুধু পালন করে যাবেন।

এ মহাসভার পূর্বে কাথলিক মণ্ডলীতে কোন 'ধর্মীয় স্বাধীনতা' ছিল না। তখন শিক্ষা দেওয়া হতো, কাথলিক ধর্ম ব্যতীত অন্য কোন ধর্মের মাধ্যমে আত্মিক পরিত্রাণ সম্ভব নয়। হয় কাথলিক ধর্ম মেনে চল, নয়তো মণ্ডলী ত্যাগ করে অন্যত্র চলে যাও। মণ্ডলীতে তখন কোন ব্যক্তি-স্বাধীনতা, বিবেকের স্বাধীনতা এবং ন্যায্যতা ছিল না।

দ্বিতীয় ভাতিকান মহাসভা কাথলিক মণ্ডলীতে নতুন ধারণা, নতুন চিন্তা, নতুন আচরণ, এবং নতুন অধিকারের পথ খুলে দেয়। এগুলোর মধ্যে রয়েছে:

১। সবদীক্ষাস্নাত নারী ও পুরুষ মিলে কাথলিক মণ্ডলী গঠন করেন। এদের মধ্য থেকে কেউ কেউ যাজক হন, ব্রতধারী হন, কিংবা বিবাহ করেন। তাদের সবার সমষ্টি মিলেই মণ্ডলী গঠিত হয়।

২। যিশুখ্রিস্টের নিগূঢ় দেহের ওপর গুরুত্বারোপ। কাথলিক মণ্ডলীর সদস্য-সদস্যাগণ (যাজকশ্রেণি, ব্রতধারী নারী ও পুরুষ এবং সাধারণ খ্রিস্টভক্তগণ) যিশুর নিগূঢ়দেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ। কোন অঙ্গই কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। সব অঙ্গই যার যার কাজ করে দেহকে সবল ও সক্ষম রাখে।

৩। কাথলিক মণ্ডলীর সদস্য-সদস্যাগণ হচ্ছেন 'ঐশ জনগণ'। এখানে সবাই সমান কিন্তু দায়িত্ব ও কর্তব্যের দিক দিয়ে তারা কেবল পৃথক-পৃথক ভূমিকা পালন করে থাকেন মাত্র।

৪। মণ্ডলীর কাজে, মঙ্গলবাণী প্রচারে, কিছু উপাসনার কাজে, দানশীল ও সেবামূলক কাজে সাধারণ খ্রিস্টভক্তগণও অংশ নিতে পারেন।

৫। খ্রিস্টভক্তগণ মণ্ডলীর ভিতর ও বাইরে (চাকুরীর ক্ষেত্রে, সরকারী পদে, সামাজিক লেনদেনে) মঙ্গলবাণীর মূল্যবোধগুলো, ন্যায্যতা, সমতা, সম্মান এবং জীবনের পবিত্রতা রক্ষা করে চলবেন।

দ্বিতীয় ভাতিকান মহাসভা যে নয়া বাণীপ্রচার চালু করেছে, তার পরিপেক্ষিতে যুক্তরাষ্ট্রের মহিলা ঐশতত্ত্ববিদ স্যান্ডি প্র্যাথার বলেন, "আপনারা [সাধারণ খ্রিস্টভক্তগণ] খ্রিস্টেতে দীক্ষাস্নাত, তাই আপনারা হচ্ছেন মণ্ডলী। জীবনে আপনারা যেখানেই যান না কেন, মণ্ডলীকে সেখানে নিয়ে যান। আর এ মণ্ডলীই হচ্ছে জীবন্ত মণ্ডলী।"

মূল কথা হচ্ছে, কাথলিক মণ্ডলীতে সব দীক্ষাস্নাত সদস্য-সদস্যাই গুরুত্বপূর্ণ, কেউই ছোট-বড় নন, যদিও তাদের কাজের ধারা ভিন্ন। সবার সমবেত, সহযোগিতাপূর্ণ ও সহভাগিতামূলক কাজের মাধ্যমেই কাথলিক মণ্ডলী সত্যিকার খ্রিস্টমণ্ডলী হয়ে ওঠবে।

বর্তমানে আশু করণীয় কিছু কাজ

১। দ্বিতীয় ভাতিকান মহাসভার শিক্ষাগুলোর দৃঢ় বাস্তবায়ন: এ মহাসভা অতীতের শ্বাসরুদ্ধকর আইন-কানুন এবং মণ্ডলী পরিচালনা পদ্ধতির বদলে যে অংশগ্রহণমূলক, সহযোগিতা-সহভাগিতাপূর্ণ এবং ক্ষমাশীল দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণের নির্দেশ দিয়েছে, তা মণ্ডলীর সর্বত্র বাস্তবায়ন করতে হবে। এ মহাসভা সমাপ্তির পর ৫৪ বছর পার হয়ে গেলেও এর শিক্ষাগুলোর অনেকটাই বাস্তবায়িত হতে পারেনি।

২। পোপের সঙ্গে বিশপদের এক হয়ে সিদ্ধান্ত ও ব্যবস্থা গ্রহণ : অতীতে শুধু পোপ মহোদয় একাই ধর্মীয় ও মণ্ডলীর প্রশাসনিক ব্যাপারে সিদ্ধান্ত ও ব্যবস্থা গ্রহণ করতেন। দ্বিতীয় ভাতিকান মহাসভা পোপের সঙ্গে মিলিতভাবে বিশপগণ যেন সিদ্ধান্ত ও ব্যবস্থা নিতে পারেন তা স্থির করে দিয়েছে। এটি যেন সঠিকভাবে মেনে চলা হয়, তা অবশ্যই দেখতে হবে।

৩। স্থানীয় মণ্ডলীর কিছু কিছু ব্যাপারে বিশপদের দায়িত্ব ও কর্তব্য নির্ধারণ : স্থানীয় পরিবেশ-পরিস্থিতি এবং স্থান-কাল-পাত্র ভেদ বিচার-বিবেচনায় এনে নিজস্ব বিশপগণ যেন নিজ-নিজ উদ্যোগে কাজ করতে পারেন তা নিশ্চিত করা উচিত। সবকিছুর জন্য ভাতিকানের দিকে চেয়ে থাকলে অতীতেও সঠিকভাবে চলেনি, ভবিষ্যতেও চলবে না, এটা প্রমাণিত সত্য।

৪। সত্যিকার অর্থে যিশুর শিক্ষা পালন : তাঁকে অনুসরণের জন্য যিশুখ্রিস্ট যে দরিদ্রতা, সেবা, ধনসম্পদ ত্যাগ, সর্বস্বত্যাগ, স্বার্থত্যাগ, দয়া ও ভালবাসার নির্দেশ দিয়েছেন, তার বিপরীতে কিন্তু কাথলিক মণ্ডলীর যাজকশ্রেণীর অনেকেই জীবন-যাপন করছেন। তাঁদের কেউ কেউ ধন-সম্পদ আহরণ, বিলাসবহুল ভবনে বসবাস এবং রংবেরং ও জৌলুসপূর্ণ পোশাক-আশাক নিয়ে ব্যস্ত। দরিদ্রতার ভাব নিয়ে দয়া-সেবা-ভালোবাসাপূর্ণ কাজ তাঁদের দ্বারা বিশেষ কিছু হচ্ছে না। এভাবে যাজকতন্ত্রই অধিকতর জোরদার হচ্ছে। পোপ ফ্রান্সিস বলেছেন যে, যাজকতান্ত্রিক মনোভাব ও আচরণের ফলেই পৃথিবীব্যাপী যাজক-বিশপদের মধ্যে যৌন অশুচিতা ও পাপ বৃদ্ধি পেয়েছে। তাই তিনি যাজক-বিশপদের মধ্যে যিশুর শিক্ষা সত্যিকারভাবে পালনের উপর গুরুত্বারোপ করছেন।

৫। স্থানীয় মণ্ডলীর ধর্মীয় ও সেবাকাজে যাজকশ্রেণি ছাড়াও ব্রতধারী এবং খ্রিস্টভক্তীয় নারী ও পুরুষকে জড়িত করা: সবাই যদি ঈশ্বরের জনগণ হয়ে থাকেন, যিশুর শিক্ষানুযায়ী তাদের সবারই দায়িত্ব ও কর্তব্য রয়েছে খ্রিস্টমণ্ডলীর বিভিন্ন ধরনের কাজে অংশগ্রহণের। কাউকে যদি এর থেকে বাদ রাখা হয়, তা খ্রিস্টের শিক্ষা ও আদেশ-নির্দেশের খেলাপ বৈকি।

৬। স্থানীয় মণ্ডলীর পরিচালনে ধর্মপ্রদেশীয় ও ধর্মপাল্লিক কাউন্সিল যাজকশ্রেণিকে সহায়তা দেবে: ধর্মপ্রদেশীয় কাউন্সিল ধর্মপ্রদেশ এবং ধর্মপাল্লিক কাউন্সিল ধর্মপল্লীর ব্যাপারাদি দেখবে। এটি দ্বিতীয় ভাতিকান মহাসভার শিক্ষা হলেও খুব কম সংখ্যক এলাকায় এগুলো সঠিকভাবে পরিচালিত হচ্ছে। যাজকতন্ত্রের কারণে এসব কাউন্সিলে ব্রতধারী-ব্রতধারিণী এবং খ্রিস্টভক্তীয় নারী-পুরুষ শুধু নামেমাত্র সদস্য-সদস্যা। সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ, ব্যবস্থা গ্রহণ, যাজকতন্ত্রের বাড়াবাড়ি এবং অর্থের অপচয় রোধকল্পে এসব কাউন্সিল বিশেষ ভূমিকা রাখতে পারে।

৭। সেমিনারীর শিক্ষা-ব্যবস্থা মণ্ডলীর বর্তমান পরিস্থিতির সঙ্গে খাপ খাইয়ে ঢেলে সাজাতে হবে: কাথলিক মণ্ডলীতে যাজকতন্ত্র এবং কিছু সংখ্যক যাজক-বিশপের যৌন-কেলেঙ্কারীর পরিপ্রেক্ষিতে সেমিনারীয়ানদেরকে বিশেষ ধরনের প্রশিক্ষণ দিতে হবে। যাজকতন্ত্র কি এবং এর ক্ষতিকর দিক, যাজক–বিশপের যৌন-কেলেঙ্কারী কি ও তার ক্ষতিকর দিক –এসব বিষয়ের বিস্তৃত, শিক্ষা উচ্চ সেমিনারীতে থাকতে হবে। যিশু খ্রিস্টের শিক্ষানুযায়ী যাজক যে শাসকের বদলে সেবক, ধন-সম্পদের অধিকারী হওয়ার বদলে দরিদ্র মনোভাবাপন্ন, এবং অহঙ্কারী ও ভণ্ড হওয়ার পরিবর্তে নম্র, ভদ্র ও সৎ হওয়ার শিক্ষা দিতে হবে। সেমিনারীয়ানদের আরও শিক্ষা দিতে হবে, তারা যেন যাজক হয়ে অধিকতর বড় পদ, সুবিধাদি আদায় এবং অর্থকড়ি ও জৌলুসের পিছে না ছুটে।

ফাদার পিটার ডেলী হচ্ছেন যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটন ডিসি মহাধর্মপ্রদেশের যাজক ও কলাম-লেখক। তিনি লিখেছেন যে, পৃথিবীর সর্বত্রই বিভিন্ন ধর্মপ্রদেশে দেখা যায় কিছু সংখ্যক যাজক কারণে-অকারণে নিজস্ব বিশপ/আর্চবিশপের সামনে ঘোরাঘুরি করেন, প্রয়োজনে-অপ্রয়োজনে সাহায্য করতে ছুটে যান, এবং তোয়াজ-তোষামোদে সময় ব্যয় করেন। তাঁদের উদ্দেশ্য হচ্ছে নিজ স্বার্থসিদ্ধি; বিশেষভাবে, ভবিষ্যতে বিশপ হওয়ার জন্য তাঁদের নাম যেন প্রস্তাব করা হয়!

অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে, এমন যাজকগণ বিশপ হয়ে সেবকের বদলে হয়ে পড়েন শাসক। ফাদার ডেলী, যাঁর রয়েছে বিভিন্ন ধর্মপল্লীতে পালকীয় কাজের ২০ বছরের অভিজ্ঞতা, প্রস্তাব করেন যে, ভবিষ্যতে এমন যাজককে বিশপ-প্রার্থী করা উচিত যার রয়েছে কমপক্ষে ১২ বছরের পালকীয় অভিজ্ঞতা। যথেষ্ট পালকীয় অভিজ্ঞতাসম্পন্ন বিশপ হবেন প্রকৃত জনগণের বিশপ, তিনি সাধারণ খ্রিস্টভক্তদের দৈনন্দিন দুঃখ-কষ্ট দেখেছেন এবং তা বুঝার চেষ্টা করেছেন। তাই তাঁর প্রকৃত দরদ ও সমর্থন থাকবে খ্রিস্টভক্তদের প্রতি, যাজকদের প্রতি নয়।

উপসংহার: কাথলিক মণ্ডলী দ্বিতীয় ভাতিকান মহাসভার শিক্ষা পালন করা শুরু করলেও বেশিদূর এগুতে পারেনি। যাজকশ্রেণী ও খ্রিস্টভক্তদের মধ্যকার পার্থক্য কিন্তু বিশেষ কমেনি। যাজকশ্রেণি শাসকই রয়ে গেছেন, এখনও তাঁরা যিশুর শিক্ষানুযায়ী সঠিক মেষপালক ও স্বার্থহীন সেবক হতে পারেননি। পোপ ফ্রান্সিস চাচ্ছেন যাজকতন্ত্রের বদলে কাথলিক মণ্ডলীতে যাজকশ্রেণি ও খ্রিস্টভক্তদের মধ্যে যেন আন্তরিকতা, সদিচ্ছা, ক্ষমা, সহমর্মিতা, সেবা, স্বার্থহীনতা, ও পবিত্রতা যেন বৃদ্ধি পায় - তাঁরা যেন খ্রিস্টেতে এক হয়ে উঠেন এবং ঐশবাণী প্রচার ও মঙ্গলকাজে আদর্শপূর্ণ অবদান রাখেন। তখন যাজকতন্ত্র তার ক্ষতিকর ডালপালা আর বিস্তার করতে পারবে না। তখন খ্রিস্টের শিক্ষার আলো অধিকতর জাজ্বল্যমান হয়ে ওঠবে॥

সামাজিক অবক্ষয়ঃ দায় কার!

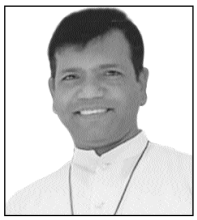

ব্রাদার রঞ্জন পিউরিফিকেশন সিএসসি

ভূমিকাঃ “সামাজিক অবক্ষয়” এই কথাটির সাথে আমরা সচেতন মানুষ হিসাবে সবাই কোন না কোনভাবে পরিচিত হয়েছি বা অভিজ্ঞতা করেছি। অবক্ষয় একটি নেতিবাচক বিষয়। নৈতিকভাবে আমরা যখন দুর্বল হয়ে পরি তখনই আমাদের মধ্যে অবক্ষয় পরিলক্ষিত হয়। তাই আমাদের এই অবক্ষয় রোধে নৈতিক শিক্ষা অর্জন করা একান্তভাবে জরুরী। সঠিক নৈতিক শিক্ষার অভাবেই সামাজিক অবক্ষয়গুলো আমাদের মধ্যে বিদ্যমান। নৈতিকতা হলো ব্যক্তি জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ। নৈতিকতা মানুষের জীবনকে সুন্দর, সাবলীল ও উজ্জ্বল করে তোলে। ইহার সমন্বয় হলে একজন মানুষ সৎ, চরিত্রবান, ঈশ্বরভীরু, দেশপ্রেমিক ও দায়িত্বশীল হয়ে উঠে।

অবক্ষয় শব্দের আভিধানিক অর্থ “ক্ষয়প্রাপ্তি” সামাজিক মূল্যবোধ তথা সততা, কর্তব্য নিষ্ঠা, ধৈর্য্য, উদারতা, শিষ্টাচার, সৌজন্যবোধ, নিয়মানুবর্তিতা, অধ্যবসায়, নান্দনিক সৃজনশীলতা, দেশপ্রেম, কল্যাণবোধ, পারস্পারিক মমতাবোধ ইত্যাদি নৈতিক গুণাবলীর অনুপস্থিতিকে বলে সামাজিক অবক্ষয়।

সামাজিক অবক্ষয় অর্থাৎ মানুষের মধ্যে মূল্যবোধের দারুণ একটা সংকট দেখা দিয়েছে। আমাদের সামনে দৃশ্যমান অনেক ঘটনাই দেখা যাচ্ছে যা প্রমাণ করে যে দিন দিন আমাদের সমাজের অবক্ষয় হচ্ছে। গণমাধ্যমগুলোই দেখিয়ে দেয় সামাজিক অবক্ষয়ের ভঙ্গুর চিত্র। পরিবার, সমাজ, দেশে যে দিকেই তাকাইনা কেন সামাজিক মূল্যবোধের ঘাটতি দৃশ্যমান। তাই পরিবার থেকে আরম্ভ করে দেশের সর্বোচ্চ স্থানীয় ব্যক্তিবর্গকে এই ব্যাপারে সচেতন হওয়া আবশ্যক। আমার ক্ষুদ্র চিন্তায় আমি ধারণা করি এই সামাজিক অবক্ষয়ের জন্য এক পক্ষ কখনোই দায়ী নয়। এর দায়ভার অনেককেই নিতে হবে। পিতা-মাতা থেকে আরম্ভে করে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে এর প্রভাব আছে বলে আমি মনে করি।

১। পিতা-মাতাঃ সন্তানের জীবনে মূল্যবোধের বীজ সর্বপ্রথম বপন করেন পিতা-মাতা। একজন সন্তানকে প্রাথমিকভাবে সুশিক্ষায় শিক্ষিত করার মূল দায়িত্ব হলো পিতা-মাতার। এই পিতা-মাতাকেই সর্ব প্রথম নৈতিক, আদর্শও চরিত্রবান হওয়া একান্তভাবে জরুরী। কারণ পিতা-মাতাকে দেখেই সন্তান শিখে। পিতা-মাতা যদি নৈতিক জ্ঞানে দুর্বল হয় তবে তাদের সন্তানও দুর্বল হয়ে ধীরে-ধীরে সমাজে বেড়ে উঠতে থাকে আর সামাজিক কলুষে কলুষিত হয়। সামাজিক অবক্ষয় রোধে প্রাথমিক কাজ পিতা-মাতার। তাই পিতা-মাতাকেই সচেতন হওয়া অনেক গুরুত্বপূর্ণ।

২। পরিবার : নৈতিক শিক্ষার প্রাণকেন্দ্র হলো পরিবার। প্রতিটি ব্যক্তির আচার আচরণের মূলভিত্তি গড়ে উঠে পরিবার থেকে। পরিবারের সদস্যরা যদি নৈতিক হয়, তাহলে শিশুরাও হয়ে উঠে নৈতিক। বাংলাদেশের প্রতিটি পরিবারের সদস্যদের অবক্ষয় রোধে সোচ্চার হতে হবে। নৈতিক শিক্ষার আদর্শ পরিবারে সন্তানদের সামনে প্রকাশ করতে হবে। তাই প্রতিটি পরিবারকে হয়ে উঠতে হবে নৈতিক শিক্ষার আদর্শ পাঠশালা। এটা করতে পারলে আমারা পাবো আদর্শবান, চরিত্রবান ও নৈতিক মানুষ। তাই পরিবারের প্রত্যেকেই সচেতন হতে হবে যেন তারা নৈতিক আদর্শ তাদের সন্তানদের সামনে প্রকাশ করতে পারে। সামাজিক অবক্ষয় রোধে পরিবার একটি অন্যতম মাধ্যম হিসাবে পরিলক্ষিত হয়।

৩। সামাজিক প্রভাব : সামাজিক অবক্ষয়ের ক্ষেত্রে সামাজিক প্রভাব আরো একটি অন্যতম কারণ। সোশ্যাল মিডিয়ার কারণে আমরা এমন কিছু অপরাধ সমাজে দেখতে পাচ্ছি যা যথেষ্ট উদ্বেগজনক। মিডিয়ায় লাইভের মাধ্যমে যৌন উশৃংখলতার উল্লাস করতেও দেখা গিয়েছে। এই চরম মাত্রার সামাজিক অবক্ষয়ের অনেক কারণ রয়েছে তার মধ্যে উল্লেখ্যযোগ্য মূল্যবোধের অবক্ষয়, সামাজিক অনুশাসনের অভাব, বিচারহীনতার সংস্কৃতি এবং পারিবারিক ও সামাজিক বন্ধনের অভাব। এখানে ভাবার বিষয় আমাদের সমাজব্যবস্থা কতটুকু ভূমিকা রাখতে পারছে।

৪। সাধারণ জনগণ : সমাজে বসবাস করতে গেলে অবশ্যই আমাদের সামাজিক

মানুষ হয়ে উঠতে হয়। সামাজিক ব্যক্তি তাকেই বলা যায় যার মধ্যে নৈতিক মূল্যবোধ আছে, চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য সুন্দর, শিষ্ঠাচারসম্পন্ন, গঠনমূলক, চিন্তাশীল, মানুষের মঙ্গল কামনা করে তাদের আমরা সামাজিক ভাবে আদর্শ মানুষ বলতে পারি। তাদের আচার আচরণ দেখেই সমাজের সাধারন মানুষ ভালো কিছু শিখবে। কিন্তু বর্তমান সময়ে এটার খুবই অভাব। আদর্শ মানুষ খুঁজে পাওয়া কঠিন। তাই আজ সমাজের এতো অবক্ষয়।

৫। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান : নৈতিক অবক্ষয় রোধে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো অনেক ভূমিকা রাখতে পারে। পাঠ্যপুস্তক গুলোর মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা নৈতিক মূল্যবোধ শিখতে পারে। শিক্ষকগণ তাদের আদর্শ দিয়েও ছাত্রছাত্রীদের নৈতিক গঠন দিতে পারেন। কিন্তু বর্তমান সময়ে এর প্রভাব অনেক দুর্বল। বিদ্যালয়গুলোতে আমরা দেখি শিক্ষকগণ শ্রেণীতে পড়ানোর চেয়ে প্রাইভেট পড়াতে বেশি আগ্রহ প্রকাশ করে কারন এখানে আর্থিক দিকটা বেশি চিন্তা করা হয়। নিয়মিত ক্লাস, পরীক্ষা, সঠিক মূল্যায়ন, ফলাফলসহ বিদ্যালয়ের কার্যক্রম অনেকাংশে প্রশ্নবোধক। সব মিলিয়ে এখান থেকেও বিরাট একটা অংশ নৈতিকভাবে অবক্ষয়ের দিকে যাচ্ছে।

৬। মিডিয়া/গণমাধ্যম : সামাজিক অবক্ষয়ের আরো একটি কারণ হতে পারে অপ-সংস্কৃতির কুপ্রভাব এবং প্রযুক্তির অত্যধিক সহজলভ্যতা। বর্তমানে প্রযুক্তিগত কল্যাণে সাংস্কৃতির আগ্রাসন, বিদেশী অনুকরনীয়তা এবং বিভিন্ন অপ-সংস্কৃতিক প্রভাব আমাদের সমাজকে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করছে। অপ-সংস্কৃতির সহজলভ্যতা যা প্রযুক্তির কল্যাণে হাতের মুঠোয় পাওয়া যাচ্ছে তা সামাজিক অবক্ষয় ঘটাতে সাহায্য করছে। এই অবাধ তথ্য প্রবাহের যুগে প্রযুক্তিনির্ভর একটি জেনারেশন গড়ে উঠেছে। অব্যবস্থাপনা, পারিবারিক অসচেতনতা ও রাষ্টীয় স্বেচ্ছাচারিতার ফলে এ তথ্যপ্রযুক্তির চরম অপব্যবহার সামাজিক অবক্ষয়ের এক অন্ধকার জগৎ সূচনা করেছে। তবে গণমাধ্যম নিসন্দেহে আমাদের কাছে কার্যকারী একটি মাধ্যম যার দ্বারা আমরা বর্হিবিশ্বের সাথে যোগাযোগ করতে পারি ও এর ইতিবাচক প্রভাবগুলো আমাদের মধ্যে বিদ্যমান।

৭। রাজনৈতিক প্রভাব : সামাজিক অবক্ষয়ের জন্য রাজনৈতিক প্রভাব কোন অংশে কম নয়। সামাজিক অবক্ষয়ের মূল কারণ অনৈতিকতা। নানাবিধ কারণে দেশে আয়ের পথ বেড়ে যাওয়ায় বেড়েছে অপরাধ। এতে বেড়ে চলেছে সামাজিক অবক্ষয়। সামাজিক অবক্ষয় রোধ করতে প্রয়োজন রাজনৈতিক সদিচ্ছা। চাঁদাবাজির মত কর্মকাণ্ড, টেন্ডারবাজি, চোরাকারবারি, মাদকব্যবসাসহ নানা ধরনের অবৈধ কর্মকাণ্ডের সাথে উঠতি বয়সের যুবকদের সম্পৃক্ততা লক্ষ্য করা যায় এবং তারা রাজনৈতিক ও বিত্তশালীদের উপর নির্ভরশীল। এরা রাজনৈকিত নেতাদের ছত্রছায়ায় অপরাধী হয়েই বেড়ে চলেছে। সামাজিক অবক্ষয়ের হাত থেকে দেশ এবং সমাজকে রক্ষা করতে পারেন রাজনৈতিক নেতারা। রাজনৈতিক নেতাদের আদর্শিক রাজনীতি অনুশীলন ও রাজনৈতিক কর্মকান্ড পরিচালনা করলেই সামাজিক অপরাধ অনেক কমে যাবে।

৮। রাষ্ট্র : সামাজিক অবক্ষয়ে রাষ্ট্রের ভূমিকাও অনেকাংশে দায়ী। রাষ্ট্রতথা সরকারে দায়িত্ব সর্বক্ষেত্রে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করা এবং এর প্রয়োগ সুনিশ্চিতভাবে কার্যকরী করা। সামাজিক অবক্ষয়ের আরো একটি কারন হচ্ছে আমাদের বিচারহীনতার সংস্কৃতি এবং বিচারের দীর্ঘসূত্রতা। একটি বিষয় লক্ষ্যণীয় যে আমাদের দেশে অপরাধ সংগঠিত হওয়ার পর প্রবল জনরোষ ছাড়া আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর তৎপরতা ততটা দেখা যায় না। এ ছাড়া আইনের জটিলতা এবং প্রয়োজন সাপেক্ষে নতুন আইন সংশোধন না করাও একটি কারণ। তাই রাষ্ট্রের বা সরকারে এই ক্ষেত্রে সঠিক ভূমিকা রাখা আবশ্যক যা নৈতিক অবক্ষয় রোধে ভূমিকা রাখবে।

৯। পাঠ্যপুস্তক : সামাজিক অবক্ষয় রোধে বা নৈতিক জ্ঞান বৃদ্ধিতে পাঠ্যপুস্তকের ভূমিকা অনেক গুরুত্ব বহন করবে। কারণ বিশাল একটি সংখ্যা যারা জ্ঞান অর্জনের জন্য তাদের শ্রম, মেধা ও সময় ব্যবহার করছে। যেখানে সরাসরি পাঠ্যপুস্তকই তাদের জ্ঞান অর্জনের সোপান স্বরূপ। পাঠ্যপুস্তকের মাধ্যমে তাদেরকে সামাজিক অবক্ষয় রোধ কল্পে সুন্দর একটা শিক্ষা দেওয়া যেতে পারে। সুতরাং পাঠ্যবইয়ের মধ্যে পাঠের সাথে সংগতি রেখে মূল্যবোধের বা নৈতিক শিক্ষার বিষয়টি সংযোগ করলে অবশ্যই কোন না কোন ভাবে শিক্ষার্থীরা নৈতিক বিষয়গুলো শিখবে এবং শিক্ষক পাঠদানের মধ্যেও এই বিষয়ে শিক্ষা প্রদান করতে পারে।

১০। ব্যবসায়ীক প্রভাব : সঠিক মূল্যবোধ শিক্ষার অভাবে সামাজিক অবক্ষয় গুলো সমাজে অনেক বেশী পরিমানে প্রকাশ হচ্ছে। সামাজিক অবক্ষয়ের দায়ভার অনেকাংশে ব্যবসাযীক মহলের মধ্যেও বিদ্যমান। অধিক পরিমানে মুনাফা অর্জনের জন্য ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলো ক্ষুদ্র থেকে আরম্ভ করে বৃহৎ পর্যায়েও তাদের নৈতিকতা বিসর্জন দিতে কুণ্ঠিত হন না। খাদ্যে ভেজাল দেওয়া, ফর্মালিন দেওয়া ইত্যাদি প্রতি নিয়তই সামাজিক অবক্ষয় হিসাবে আমরা দেখছি। সামাজিক অবক্ষয়ের চরম লক্ষণ হিসাবে দেখা যাচ্ছে যে, খুব সহজ লভ্য এবং হাতের নাগালে বিভিন্ন ধরনের নেশা জাতীয় দ্রব্য হাতছানি দিচ্ছে। যা সেবন করে বর্তমান যুব সমাজের বিরাট একটা অংশ নৈতিকতার চরম পর্যায়ে চলে গেছে, যারা দেশ ও জাতির ভবিষ্যৎ। সামাজিকভাবে এরাই সমাজে বিশৃংখলা তৈরী করছে এবং সামাজিক অবক্ষয়ের দৃশ্যমান প্রমাণও রাখছে।

১১। নেতিবাচক প্রভাব : সমাজে বসবাসকারী ব্যক্তিদের মধ্যে মূল্যবোধ বা নৈতিকতার অভাব হলে সামাজিক অবক্ষয় আসবেই অর্থাৎ এর নেতিবাচক প্রভাব সমাজের প্রতিটি স্তরে বিদ্যমান থাকবে। নেতিবাচক প্রভাব হিসাবে আমরা প্রতিদিনই দেখছি কোন না কোন শিশু হত্যা, শিশু নির্যাতন কিংবা শিশু বলাৎ কারের মতো ভয়ঙ্কর নির্মমতা, নারী ধর্ষণ এবং হত্যা। শিক্ষা থেকে ঝরে গড়া, সন্ত্রাসী কর্মকান্ড, বখাটে হয়ে যাওয়া, রাজনৈতিক অস্থিরতা ইত্যাদির প্রভাব আমরা আমাদের সমাজে দেখছি। মানুষের মনমানসিকতায়, পরিবারে, সমাজ তথা দেশের মধ্যে এর ব্যাপক প্রভাব পরিলক্ষিত হচ্ছে।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

১। মোঃ শাম সুল ইসলাম সাদিক (প্রকাশ আগষ্ট ১, ২০১৯ ইন্টারনেট)
২। ইত্তেফাক, ২৮ আগষ্ট, ২০১৮
৩। যায় যায়দিন, ৯ অক্টোবর, ২০২০
৪। মত-বিশ্লেষণ, ইন্টারনেট, আগষ্ট ১৯, ২০১৭ (শাহ মোঃ জিয়াউদ্দিন)॥

ধরিত্রি রক্ষায় আমাদের করণীয়

অর্পা কুজুর

ঈশ্বর আমাদের ভালবেসেছেন এবং এই পৃথিবীতে ভাল থাকার জন্য আমাদের সবকিছু দিয়েছেন। আকাশ, বাতাস, পাহাড়, সমুদ্র, শস্য শ্যামল, সবুজ বনরাজি, মাটি, পানি, নদী, খালবিল, ফুল পাখি, ফল এবং মানুষসহ বিভিন্ন প্রজাতির প্রানী ঈশ্বর সৃষ্টি করেছেন এবং আমাদের সুন্দরভাবে বেঁচে থাকবার জন্য দান করেছেন যেন আমরা পরিপূর্ণ তৃপ্তি নিয়ে এই পৃথিবীতে বেঁচে থাকতে পারি। আমরা আমাদের চারিপাশে যা কিছু আছে তা নিয়েই আমাদের পরিবেশ, তা নিয়েই আমাদের জীবন-যাপন এবং বেঁচে থাকা কিন্তু পরিবেশের সবকিছু আমাদের সামনে দৃশ্যমান নয়। বাতাসে অনেক উপাদান আছে তা কিন্তু দৃশ্যমান নয়। পরিবেশের মধ্যে অদৃশ্য অনেক কিছুই রয়েছে যা আমাদের বেঁচে থাকার জন্য সহায়ক। আমরা জানি না পানি বা জল কোথা থেকে এবং কিভাবে তৈরী হচ্ছে। আমরা জানি না আমাদের বেঁচে থাকবার জন্য বাতাস এবং বাতাসে অক্সিজেন অনবরত এবং কিভাবে তৈরী হচ্ছে। আমরা জানিনা আমাদের ভূ-পৃষ্ঠের অপরিসীম ক্ষমতার উৎস কোথায় যেখানে আমরা ঘরবাড়ি এবং বিভিন্ন শক্ত মজবুত স্থাপনা এবং আমাদের আবাসস্থল তৈরী করে নির্বিঘ্নে জীবন যাপন করছি। আমরা জানি না সৌরশক্তি কিভাবে পৃথিবীতে প্রাণের সঞ্চার ঘটায়। আমরা জানিনা জীব-বৈচিত্রের সুবিন্যস্ত অবস্থান কিভাবে তৈরী হয়েছে এবং বেঁচে থাকার পারস্পারিক নির্ভরশীলতার চক্রটি কিভাবে সৃষ্টি হলো। আমরা জানি না আমাদের চারিপাশে প্রকৃতি পরিবেশের রং গাছের পাতা, ফল ফুলের রং কিভাবে তৈরী হচ্ছে যে রং, রস ও গন্ধ আমাদের মুগ্ধ করে তুলে। এসবই হলো সৃষ্টির মহান রহস্য এবং এসব কিছুই ঈশরের মহান সৃষ্টি! মহান সৃষ্টির এই রহস্যময় নিগুঢ় তত্ত্ব বড়ই অপরিসীম বিষয় যা সাধারণ মানুষ হিসেবে কখনই আমরা তা বুঝে উঠতে পারি না। আমাদের প্রতি ঈশ্বরের ভালবাসা এবং তার দয়া দানের তার প্রতি সকল সময় কৃতজ্ঞ থাকা সেই সাথে ধন্যবাদ ও প্রশংসা করা আমাদের নিত্য দিনের দায়িত্ব।

ধরিত্রি অর্থাৎ এই পৃথিবী হলো অফুরন্ত সম্পদের ভাণ্ডার। যেখান থেকে আমরা আমাদের বেঁচে থাকবার জন্য যা কিছু প্রয়োজন সবই পেতে পারি এবং তা কখনই শেষ হবার নয় যদি না আমরা তা কখনই ধ্বংস করার চেষ্টা না করি। আমাদের অনুধাবন করতে হবে যে বাসযোগ্য আবাসভূমি হিসেবে এই পৃথিবীর মৌলিক বিষয়গুলি কি? আমাদের বেঁচে থাকবার প্রধান উপাদানগুলি কি? কিভাবে তা টেকসই এবং সর্বজনীন হতে পারে? আমাদের গভীরভাবে অনুধাবন করতে হবে যে মাটি, পানি, বায়ু এবং সূর্যের আলো বা তাপ পৃথিবীর অপরিহার্য সত্তা। এই সত্তা ছাড়া পৃথিবীতে কোন প্রাণের সঞ্চার সম্ভব নয়। আমাদের আরও গভীরভাবে উপলব্ধি করতে হবে যে পৃথিবীর এই একান্ত অপরিহার্য সত্তাগুলি একমাত্র ঈশ্বর ছাড়া কোন মানুষ বা বৈজ্ঞানিক তৈরী করতে পারেন না। তবে বিজ্ঞান একটি সর্বোত্তম মাধ্যম যার মাধ্যমে আমরা পৃথিবীর এই আদি সত্তা এবং মৌলিক উপাদান মাটি পানি বায়ু এবং সুর্যের তাপকে সঠিক ব্যবহারের জন্য পরিবর্ধন পরিমার্জন করে রূপান্তর ঘটাতে পারি এবং সকলের ব্যবহার উপযোগী করতে পারি এর বেশি কিছু নয়। তাহলে প্রশ্ন আসতে পারে আমরা যা সৃষ্টি করতে পারি না তাহলে কেন তা ধ্বংস করি? এই প্রশ্নটি সকল সচেতন বিবেকের কাছে। কারণ আমাদের বিবেকহীন কাজ আমাদের প্রিয় আবাসভূমিকে ধ্বংসের মুখে নিয়ে যাচ্ছে। আমাদের বিবেকহীন কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে আমাদের বেঁচে থাকার মৌলিক উপাদান সমুহ তার সঠিক গুণাগুণ ধরে রাখতে পারছে না। হারিয়ে ফেলছে তার ভারসাম্য। প্রকৃতি হয়ে পড়ছে গতিহীন ছন্দহীন এবং দুর্যোগপ্রবণ। আমরা আমাদের বিবেকহীন স্বার্থপর আচরণ দিয়ে মাটি, পানি ও বাতাসকে দূষিত করে ফেলছি। সূর্যের আলোকে আমরা স্বাভাবিকভাবে পৃথিবীতে পৌঁছতে দিচ্ছি না তাকেও দিনে দিনে প্রচণ্ডরকম প্রখর করে তুলছি। প্রকৃতির সকল বিপর্যয়ের মূলে রয়েছে মানুষের সীমাহীন স্বার্থপরতা এবং বিবেকহীন কর্মকান্ড ও আচারআচরণ। মানুষের স্বার্থপর এবং বিবেকহীন কাজের উদাহরণ হলো- তেল গ্যাস পুড়িয়ে কলকারখানা নির্মান করছি, দ্রব্য সামগ্রী উৎপাদন করছি কিন্তু গাড়ির, কলকাখানার কালো এবং দুষিত ধোয়াকে নিয়ন্ত্রন করছি না। উন্মুক্ত বাতাসে তা ছেড়ে দিচ্ছি। যেখানে সেখানে ময়লা ফেলে মাটি পানিকে সাথে বাতাসকেও দূষিত করছি। সামান্য অর্থ প্রয়োজনে গাছ কাটছি কিন্তু গাছ লাগানোর প্রয়োজন মনে করছি না কারণ অর্থ ছাড়াও গাছ আরও যে কত উপকার করতে পারে তা আমাদের বোধর মধ্যে নেই। আমরা আকাশে সেটেলাইট পাঠিয়ে, রকেট, বিমান চালিয়ে ওজন স্তরকে হালকা করে ফেলছি। আকাশযানে ব্যবহৃত হাইড্রোজেন ফুয়েল ওজন স্তররের গভীরতাকে কমিয়ে আনছে এবং সূর্যের আলোর সাথে অতিবেগুনি রশ্মি সরাসরি পৃথিবীতে এসে পড়ছে। প্রাত্যহিক জীবনের বিলাসিতা নীতিবোধহীন প্রযুক্তির ব্যবহার আমাদের চারিপাশের পরিবেশকে আরও বিপর্যয় করছে। বর্জ ব্যবস্থাপনার সঠিক পদ্ধতিগত ধারণা ও জ্ঞান আমাদের নেই। আমরা বেশি মুনাফা লাভের জন্য ব্যবসায়িক মনোভাব লালন করছি বিধায় বড় বড় ব্যবসায়িক অবকাঠামো গড়ে উঠছে যেখানে বন, জঙ্গল, পাহাড়, পর্বত, নদীনালা, খালবিল, আকাশ সমুদ্র কিছুই রক্ষা পাচ্ছে না। সেই তুলনায় পরিবেশ প্রকৃতি রক্ষানাবেক্ষণের জন্য পর্যাপ্ত শিক্ষা, গবেষণা, পরিকল্পনা, নীতিমালা এবং বিভিন্ন সাংগঠনিক উদ্যোগ পরিলক্ষীত হয়না। আমাদের জীববৈচিত্র আজ ধ্বংসের সম্মুখিন। আমাদের পরিবেশ ও প্রতিবেশ চক্রটি (Ecological Conservation System) আজ বিপন্ন। আমরা যদি এখনই প্রকৃতির প্রতি যত্নশীল না হই তাহলে হয়ত আমাদের অস্তিত্বই বিলিন হয়ে যাবে। আমাদের সকলের উচিত হবে ধরিত্রি রক্ষায় প্রকৃতি ও পরিবেশের প্রতি যত্নশীল হওয়া এবং দায়িত্বশীল আচরণ করা।

ধরিত্রি রক্ষার জন্য আমাদের সবাইকে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হতে হবে। কারণ এ ধরিত্রি হলো মানুষের জন্য ঈশ্বরের শ্রেষ্ঠ দান এবং একমাত্র মানুষই হলো শ্রেষ্ঠ প্রাণী যার জ্ঞান বুদ্ধি ও বিবেক রয়েছে। ঈশ্বর মানুষকে সকল প্রাণীর উর্ধ্বে রেখেছেন এবং কর্তৃত্ব করার অধিকার দিয়েছেন। দায়িত্বশীল মানুষ হিসেবে ধরিত্রি রক্ষায় আমাদের যা করতে হবে তা হলো-**(১)** মানুষ হিসেবে সৃষ্টিকর্তার ধন্যবাদ ও প্রশংসা করা কারণ এ বিশ্ব ভ্রম্মাণ্ড ঈশ্বরের সৃষ্টি তিনিই সকল কিছু সৃষ্টি করেছেন। আমরা যখন ধন্যবাদ ও প্রসংশা করি তখন তার প্রতি কৃতজ্ঞ হই। কৃতজ্ঞতা বোধর চেতনা ও মূল্যবোধ কখনই ধ্বংস করে না বরং সবকিছু যত্ন করে এবং ভালবেসে তা লালন ও পালন করে। **(২)** আমাদের সহভাগিতার সংস্কৃতি চর্চা করতে হবে। পরিবেশ ও প্রকৃতিকে রক্ষার জ্ঞান ও দক্ষতাগুলি সবার মধ্যে ছড়িয়ে দিতে হবে। আমাদের সমাজের সম্পদের সহভাগিতা থাকতে হবে। একা ভোগ করার স্বার্থপর মনমানসিকতা থেকে বেরিয়ে আসা খুবই জরুরি। ব্যক্তিকেন্দ্রিক চিন্তা চেতনা পরিবেশ রক্ষার জন্য কখনই সহায়ক নয়। **(৩)** প্রাকৃতিক সম্পদের প্রতি যত্নশীল হওয়া খুবই জরুরী। পানি মাটি গাছপালা বন জঙ্গল বিল হাওড় রক্ষার জন্য সকলকেই

(৬৯ পৃষ্ঠায় দেখুন)

আমার দায় : প্রসঙ্গ সমবায় সমিতি

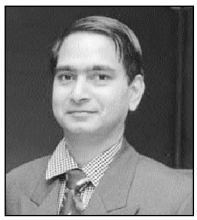

অমিয় জেমস এসেনসন

আমার একটি আঙ্গুল যখন অন্যের দোষ-ত্রুটির দিকে নির্দেশ করে, ঠিক তখনি হাতের বাকি কমপক্ষে তিনটি আঙ্গুল আমার দিকে নির্দেশ করে। সাম্প্রতিক সময়ে আমাদের কিছু সমবায় ঋণদান সমিতিসংশ্লিষ্ট অনিয়ম- বিশেষভাবে আর্থিক অনিয়ম ও লুটপাটের খবর শুনে এই অঙ্গুলি নির্দেশের দুটি দিক ভাবছি। আমাদের সমবায় ঋণদান সমিতিসহ অন্যান্য সমবায়ের অনিয়ম প্রতিরোধে আমার ও আমাদের কি করার ছিল, কি করেছি এবং এখন কি করছি।

বেশিরভাগ সদস্য শুধু সমিতিতে নিয়মিত লেনদেন করে এবং ঋণ তুলেই আমাদের দায়িত্বের সীমাবদ্ধতা বজায় রেখেছি। সমিতি পরিচালনার দায়িত্ব অন্যদের ওপর ছেড়ে দিয়েছি। মনে করেছি, সমিতির নেতৃত্বের জন্য একটি বা কয়েটি নির্দিষ্ট দল বা গোষ্ঠি আছে যা শুধু তাদেরই দায়িত্ব। আবার অনেকেই মনে করছি, ওসব করবে যারা "নেতাগিরি" করে তারা, যারা নিজের খেয়ে বনের মোষ তাড়ায় তারা। খারাপ-ভালো দুই দৃষ্টিতেই আমরা সমিতির পরিচালকদের দেখে এসেছি। এছাড়াও আমরা অনেক সময় বুঝে না বুঝে অথবা মুখ চেয়ে অসৎ লোককে নির্বাচিত করেছি এবং সমিতি পরিচালনার গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব অর্পণ করেছি। অন্যদিকে, সমিতির দায়িত্ব নেয়ার ক্ষেত্রে নিজের অংশগ্রহণের বিষয়টি এড়িয়ে গেছি।

আমরা বছরে একবার সাধারণ সভায় উপস্থিত হলেও কখনও ভালভাবে অংশগ্রহণের চেষ্টা করেছি কি? আমি কি সমিতির বার্ষিক রিপোর্ট সম্পূর্ণ পড়ে ও বুঝে নিজের মত দিতে চেষ্টা করেছি? নাকি শুধু আলোচনার জন্য আলোচনা ও সময় ক্ষেপণে সহায়ক ভূমিকা রেখেছি? একসময় ধৈর্যহারা হয়ে কখন সভা সমাপ্ত হবে সেটাই কি আমার মূল বিষয় হয়নি?

এখন সময় এসেছে আমাদের সকলকেই সংশ্লিষ্ট সমিতি নিয়ে ভাবা এবং কার্যকরী পদক্ষেপ নেয়া। সদস্যগণ সচেতন হলে উপযুক্ত নের্তৃত্ব আসবে এবং যেখানে লুট-পাটের রাজত্ব চলছে তা বন্ধ হবে। সচেতন সদস্য কখনও মুখ চেয়ে অযোগ্য-অসৎ ব্যক্তিকে- এমনকি আত্মীয় বা বন্ধু হলেও- ভোট দিবে না। সচেতন সদস্য যেমন কখনও নিয়ম বহির্ভূতভাবে সুযোগ-সুবিধা নিতে চেষ্টা করবে না, ঠিক তেমনি সৎ ও যোগ্য পরিচালক কখনও শুধু পুনরায় ভোট পাবার আশায় অনিয়মকে প্রশ্রয় দিবে না এবং নিজেরা নামে-বেনামে লুট করার চেষ্টা করবে না। আর কেউ অনিয়ম করলেও বেশিদূর আগাতে পারবে না সচেতন সদস্যদের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ও পদক্ষেপের কারণে।

আমাদের প্রত্যেকেরই কিছু না কিছু সীমাবদ্ধতা রয়েছে এবং তা স্বীকার করেই আমাদের সামনে এগিয়ে যেতে হবে। তবে সমিতি পরিচালনার দায়িত্ব আমি যাকে দিব সে ব্যক্তির অন্যান্য গুণাবলীর মধ্যে সততা এবং সমিতির জন্য স্বেচ্ছাশ্রম দেয়ার জন্য সময় ও ইচ্ছা থাকা চাই।

অপরদিকে, আমি যদি সমিতির নেতৃত্বে থাকি তবে আমার উচিত পরবর্তী নেতৃত্ব তৈরি হওয়ার পরিবেশ সৃষ্টি করা এবং যোগ্য ও সম্ভাব্য সদস্যদের অনুপ্রাণিত করা। যোগ্য নেতার একটি বড় গুণ হলো যোগ্য উত্তরসূরী তৈরী করা। তাছাড়া, কিছু অবশ্য পালনীয় নিয়ম, যেমন: গুরুত্বপূর্ণ পদে কোন ব্যক্তি তার জীবনদশায় দুই মেয়াদের বেশি থাকতে পারবে না-এ ধরণের কিছু নিয়ম থাকলে নতুন নেতৃত্ব সৃষ্টি হবে।

সময় এসেছে নারী নেতৃত্ব অনুপ্রাণিত করা। নারী-পুরুষের সমতা রেখে এখনই সমিতির নতুন নেতৃত্ব নিয়ে ভাবা উচিত। সে ক্ষেত্রে নারী সদস্যদের এগিয়ে আসতে হবে এবং নিজেদের জায়গা করে নিতে হবে সমিতির মঙ্গলার্থে। নারী বা পুরুষ সকল সদস্যেরই সমান অধিকার রয়েছে সমিতিতে। দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনের মধ্যদিয়ে সে অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে হবে। সময় হয়েছে এগিয়ে আসার। তা নাহলে অতি প্রয়োজনীয় এই সমিতিসমূহ হয়ত ধীরে-ধীরে বিলীন হয়ে যাবে। আমাদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ব্যহত হবে। সর্বোপরি, বহু বছরের ঐতিহ্য আমরা হারিয়ে ফেলব যা কোনভাবেই কাম্য নয়। আসুন, অন্যের মুখাপেক্ষি না থেকে সমিতির মঙ্গলার্থে নিজেকে কোন না কোনভাবে সংস্পৃক্ত করি যেন যে সমিতি ভালো চলছে তা যেন ধারাবাহিকভাবে আরো ভালোভাবে চলে এবং যেগুলো ভালো চলছে না তা যেন সুষ্ঠুভাবে চলার পথে ফেরে ॥

যিশুর দরশনে

সিস্টার মেরী সুস্মিতা এসএমআরএ

নববিধানের আলোক ছড়িয়ে, দাউদ বংশে
বেথলেহেমের কুঞ্জছায়ায় অতি দীনবেশে,
আজ জন্মেছেন এক মহান শিশু
নাম তার খ্রিস্টরাজ শিশু যিশু।
তিনি এসেছেন, এসেছেন এ ধরায়
জীর্ণ-শীর্ণ ছোট্ট এক গোশালায়।
মহাশীতকালে গভীর নিশীথে
জড়িয়ে আছেন তিনি ক্ষুদ্র যাবপাত্রে।
এটিই তাঁর রাজসিংহাসন
তিন পণ্ডিত এবং রাখালগণেও তাঁকে করলো বরণ।
এমন বেশে কে এসেছে বলো?
একমাত্র তিনিই, এসো তাঁরে পূঁজি চলো।
অথচ তিনি চিরপরিত্রাতা,
আর এই জগতের মুক্তিদাতা।
জগত যেন আজ ধন্য,
ধন্য তব ত্রাণেশ্বরের জন।
তাই প্রাণ ভরিয়ে তব জীবনানন্দে
নাচি মোরা ছন্দে-ছন্দে।
কত আলোক কত জয়ধ্বনি,
কত সুর কত গান আর আনন্দ ধ্বনি।
ঘরে ঘরে দেখ কি আলোকধারা,
জন্মদিনের শুভক্ষণে সকলে মোরা
আত্মহারা।
তবে এসো হিংসা বিদ্বেষ ভুলে
মলিন মানব মোরা, হৃদয় খুলে,
খ্রিস্টযিশুকে বরণ করি এই বড়দিনে,
নতুনভাবে, নতুনরূপে, তঁরাই দরশনে॥

কথার কথা

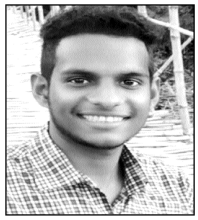

কাজল সামুয়েল গমেজ

সুন্দর করে কথা বলা একজন সুন্দর মানুষের অন্যতম একটি গুণ। সুন্দর করে কথা বলা একটি শিল্প। যিনি সুন্দর করে কথা বলেন, তিনি শিল্পী, বাক্‌শিল্পী। কারো চেহারা ভালো হলে বলি, সুন্দর। এই সৌন্দর্য তার জন্মগত রূপ। কেউ সুকণ্ঠের অধিকারী হলে বলি, বাহ্! কী সুন্দর গলা! কেউ যখন খুব সুন্দর গান করে শ্রোতাদের প্রিয় হয়ে ওঠে, আমরা বলি, জন্মগত প্রতিভা। এভাবে নানা বিষয়েই আমরা নানান সৌন্দর্যের তারিফ করে থাকি কিন্তু কেউ যদি দেখতে কম সুন্দর হন! তিনি যদি পরিচ্ছন্ন ও মানানসই পোশাক পরেন, তবে কিন্তু কম-সুন্দর ব্যক্তির চেহারায়ও সৌন্দর্যের আলো ফুটে ওঠে। আমরা দেখি, জন্মগত প্রতিভা ছাড়াও অনেক গায়ক কেবল ধারাবাহিক অনুশীলনের মাধ্যমে শ্রোতাদের মন জয় করে ক্রমে-ক্রমে জনপ্রিয় গায়ক হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেন। তেমনি জীবনের সব ক্ষেত্রে আমরা দেখি জন্মগত প্রতিভা ছাড়াও একাগ্রতা, নিষ্ঠা ও ক্লান্তিহীন অনুশীলনের মাধ্যমে ব্যক্তি ভিন্ন-ভিন্ন ক্ষেত্রে হয়ে উঠেন আলোচনা-সমালোচনার কেন্দ্রবিন্দু। আর তারাই অনন্য হিসেবে নিজেকে উজ্জ্বল করেছেন। করেছেন চিরভাস্বর।

হ্যাঁ, কণ্ঠস্বরের সৌন্দর্যকে আমরা জন্মগত বলে ধরে নিতে পারি কিন্তু কথার সৌন্দর্যকে জন্মগত সৌন্দর্য বলতে পারি না। কেবল সুন্দর কণ্ঠস্বরই সুন্দর কথার পূর্বশর্ত নয়। সুন্দর কথার প্রধান শর্ত ভাষা, বাচনভঙ্গি, কণ্ঠস্বর। সুন্দর করে যারা কথা বলেন, তাদের কথা থেকে রুচি আর ব্যক্তিত্বের উভয় পরিচয়ই পাওয়া যায়। যার চিন্তা যত পরিষ্কার, যার জ্ঞান যত গভীর, যার মন যত সংবেদনশীল তার কথা বলাটাও তেমনি আকর্ষণীয় হয়। অনেক-অনেক কথা না বলে যিনি অল্প কথায় অনেক কিছু বোঝাতে পারেন তিনিই সুন্দর কথক। আমরা যদি একটু আন্তরিকভাবে চেষ্টা ও চর্চা করি তবেই সুন্দর করে কথা বলার অভ্যাস করতে পারি। নিজেকে সুন্দর বাচনভঙ্গির মাধ্যমে অন্যের কাছে উপস্থাপন করতে পারলে জীবন গঠন অনেক সহজ আর আনন্দময় হয়ে ওঠে। সুন্দর করে কথা বলাটা যে খুব বেশি কঠিন এমনটা কিন্তু নয়। তাই কোন একটা আলোচনায় যোগ দিতে গেলে আমাদেরকে আগে শুনতে হবে কে কী বলছে। কথার ভাজ না বুঝেই হুট করে কোন মন্তব্য করা বোকামির কাজ। তাই কথা বলার পূর্বে আমাদেরকে কিছুক্ষণ চিন্তা করতে হবে। যদিও এটা সব সময় সম্ভব নয়! তবুও কে কিভাবে কথা বলছেন সেটা খেয়াল করতে হবে। যিনি সুন্দর করে কথা বলছেন তাকে খুব মনোযোগ দিয়ে শুনতে হবে। তিনি হয়তো আমার-আপনার থেকে অনেক জানেন, তাতে কি! আমরাও একসময় জানব। কথা বলার পূর্বে আমাদেরকে মনে মনে ভাবতে হবে কিভাবে নিজেকে উপস্থাপন করব। আমরা কিন্তু শিশু অবস্থায় দেখে দেখে ও শুনে শুনেই কথা শিখি! সত্যি কথা বলতে কি কথা শেখার বিষয়। তাই কোন আলোচনার ক্ষেত্রে শুধু নিজেই হড়বড় করে সব বলে যাব, এটা স্মার্টনেসের মধ্যে পড়ে না। বরং যার সাথে কথা বলি তার প্রত্যেকটা কথা শোনা এবং বোঝাও স্মার্টনেসের অন্তর্ভুক্ত। কারো সাথে কথা বলার সময় সরাসরি তার দিকে কিংবা তার চোখের দিকে তাকাতে হয়। তার কথায় সম্মতি জানাতে হয়, মাথা বা হাত নেড়ে তাকে বোঝাতে হয় যে তার কথা মন দিয়ে শুনছি। কারো কথা শোনার সময় মন দিয়ে শুনতে হবে এবং তার প্রশ্ন বুঝার চেষ্টা করতে হবে। কারণ প্রশ্ন ঠিকভাবে বুঝলেই কেবল আমরা সঠিক উত্তরটা দিতে পারি, এতে ভুল বুঝাবুঝিরও কোন অবকাশ থাকবে না।

অনেকেই আছেন যারা কথা বলা শুরু করে মাঝে একটা উদাহরণ দিতে গিয়ে একটা গল্প বা কৌতুক শুরু করে দেন। আর শেষে আসল টপিকটা ভুলে গিয়ে গল্প শেষে নির্লজ্জের মতো হাসি দিয়ে বলেন- ইয়ে, মানে, আমি কোথায় যেন ছিলাম? এসব মানুষের কথায় উপস্থিত সকলে কঠিন বিরক্ত হয়। রাগ হয়। পরের বার আর তার কথা শুনতে চান না কেউই। সবাই নিশ্চয় তাদের মূল্যবান সময় সেই ব্যক্তির গল্প শুনতে সময় নষ্ট করবেন না? তাই টপিকের দিকে মনোযোগ দিতে হয়। যদি এমন হয় তবে লিখে রাখুন। কাগজে লিখে তবেই গল্প, উদাহরণ যা দেবার দিন। এতে আপনার মনে থাকবে আপনি সত্যিই কোথায় ছিলেন। কথা বলার সময় অঙ্গভঙ্গির গুরুত্ব অনেক। অনেকেই আছেন এক হাত পকেটে রেখে অন্য হাত নাড়িয়ে কথা বলেন। অনেকেই দুহাত নাড়িয়ে কথা বলেন। আবার অনেকে হাত না নাড়িয়েই কথা বলেন। যখন যা বলবেন তা বুঝাতে যেভাবে অঙ্গ সঞ্চালন করা দরকার সেটাই করা উচিত। সুন্দর করে কথা বলার ক্ষেত্রে এটাও আবশ্যক। আপনার কথার মূল্য অনেকগুণ বাড়িয়ে দিতে পারে আপনার সঠিক অঙ্গভঙ্গি। আপনার দাঁড়ানো বা বসার ভঙ্গি, হাত নাড়ানো এসব দিকে মনোযোগ দিন। কোন কিছুই অতিরিক্ত করার দরকার নেই। তবে কথার সাথে যেন অঙ্গভঙ্গি খাপ খায় সে চেষ্টা করুন। অনেকেরই অভ্যাস থাকে অন্যের সাথে কথা বলার সময় কাঁধে হাত দেয়া বা বার-বার গায়ে খোঁচা দিয়ে নিজের দিকে মনোযোগ ফেরানোর। আপনার যদি এমন কোন অভ্যাস থেকে থাকে, দয়া করে এখনি পরিহার করুন। কেননা তা মোটেই শোভনীয় নয়।

আমাদের দেশে অনেক আঞ্চলিক ভাষা প্রচলিত আছে। তার মধ্যে কিছু শুনে তো প্রথমে বোঝার কোন উপায়ই নেই যে সেগুলো আসলেই বাংলা ভাষা নাকি অন্য কিছু! তবে হ্যাঁ, নিজ-নিজ আঞ্চলিক ভাষাকে আমাদের প্রত্যেকেরই সম্মান করতে হবে। সে ভাষায় কথা বলুন কিন্তু এটাও খেয়াল রাখবেন তা যেন আপনার কথায় কোন ছাপ না ফেলে যায়। আপনার কথায় যদি আঞ্চলিক উচ্চারণ-ভঙ্গি চলে আসে বা কোন আঞ্চলিক শব্দ ঢুকে পড়ে তবে অফিসে, ক্লাশে বা বন্ধুদের সামনে যেখানেই যান, আপনাকে অনেক অসুবিধার সম্মুখীন হতে হবে। বিশেষ করে চাকরির ইন্টারভিউ দেবার সময় সর্বাবস্থায় আঞ্চলিক বাচনভঙ্গি পরিহার করতে হয়। মানুষের মুখের কথাতেই তার হৃদয়ের পরিচয়। বলুন তো, পৃথিবীতে কোন মানুষকে সবচেয়ে সুন্দর লাগে? একটা মানুষকে সব থেকে সুন্দর লাগে তখন যখন সে হাসে। এবার ভাবুন তো, কোন দোকানে যেতে আপনার ভাল

লাগে? যেসব দোকানে হাসিমুখে আন্তরিকতার সাথে কথা বলে নাকি যেখানে সবসময় গুমোট হয়ে মুখ অন্ধকার করে কথা বলে? অথবা চোখ বন্ধ করে ভাবুন তো, কোন মানুষটাকে আপনার নিজের খুবই ভাল লাগে? দেখবেন, হাসিমুখের মানুষগুলোই আপনার মনে প্রিয় জায়গাটি দখল করে বসে আছে। তাই ঈশ্বর প্রত্যত্ত এই অসম্ভব সুন্দর গুণটিকে কথা বরার সময় ব্যবহার করুন। আমাদের দৈনন্দিন কথার মাঝে কখনই কোন নেতিবাচক কথা ব্যবহার করা উচিত নয়। কারণ নেতিবাচক কথাবার্তা হতাশার সৃষ্টি করে। একটা উদাহরণ দেয়া যাক, একবার এক ম্যারেজ কাউন্সিলরের কাছে এক দম্পতি গিয়েছিলেন পারিবারিক সমস্যা নিয়ে। ম্যারেজ কাউন্সিলর তাদের সাথে কথা বলে জানলেন, প্রতিদিন স্ত্রী তার স্বামীকে বাজার প্রসঙ্গে বলে: চাল নাই, ডাল নাই, চিনি নাই, লবণ নাই, মাছ নাই, মাংস নাই ইত্যাদি ইত্যাদি। এই নাই-নাই শুনতে-শুনতে বেচারা স্বামী ভদ্রলোক একটি শূন্যতা অনুভব করেন। এই কথা শুনে ম্যারেজ কাউন্সিলর স্ত্রীকে পরামর্শ দিলেন, এখন থেকে কথাগুলো একটু ঘুরিয়ে বলতে। যেমন: এই 'নাই' এর জায়গায় বলতে হবে 'লাগবে'। এই কথাগুলোই যদি ঐ স্ত্রী এভাবে বলতেন যে, চাল লাগবে, ডাল লাগবে, চিনি লাগবে, লবণ লাগবে, মাছ লাগবে, মাংস লাগবে; তাহলে হয়ত সংসারে অশান্তি অনেক কমে যেত। কারণ 'নাই' শব্দটির চেয়ে 'লাগবে' শব্দটি ইতিবাচক। এটি কানে ও মনে ভাল অনুসরন সৃষ্টি করে।

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর গীতাঞ্জলি কাব্যগ্রন্থের জন্য নোবেল পুরষ্কার পান ১৯১৩ খ্রিস্টাব্দে। তাতে পশ্চিমাদের অনেকেরই এটা সহ্য হচ্ছিল না। একবার এক পশ্চিমা সাহেব রবীন্দ্রনাথকে বলেই বসলেন, গীতাঞ্জলি বইটি দারুণ হয়েছে। তবে বলেন তো বাপু, কে আসলে ওটা লিখে দিয়েছিল আপনার হয়ে? সঙ্গে-সঙ্গে বেরিয়ে এলো কবিগুরুর বুদ্ধিদীপ্ত উত্তর। কবিগুরু বললেন, তার আগে আপনি বলুন তো দেখি, কে আসলে আপনাকে পড়ে দিয়েছে গীতাঞ্জলির মতো কাব্য। একবার নিজেকে কবিগুরুর ঐ সময়ের স্থানে বসিয়ে ভাবুন তো, আপনি কি উত্তর দিতেন? তাই কথার প্রয়োজনে নিজের বুদ্ধিকে ব্যবহার করতে হয়। বিদ্রুপকারীর সাথে তর্কে লিপ্ত হওয়ার পরিবর্তে বিদ্রুপের বুদ্ধিদীপ্ত উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করতে হয়। কথা বলার ক্ষেত্রে সততাও অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের সততা আমাদের শ্রোতাদেরকে দারুণভাবে প্রভাবিত করে। সবাই আমাদের ভেতরকার মানুষটাকে শুনতে চায়। আমাদের মধ্যে নানা কপটতার ফলে এই গুণ ধীরে-ধীরে চাপা পড়ে যায়। তাই সততার সাথে কথা বলুন, কিন্তু সততাকে যেন ঘিরে রাখে ভালোবাসা ও সহনশীলতা। ভালোবাসা আর সহনশীলতা মেশানো সততা আমাদেরকে করে তুলে সবার থেকে আলাদা। আমাদের নিজস্বতাই আমাদের সবচেয়ে বড় শক্তি। তাই নিজের ওপর বিশ্বাস রাখুন। নিজের সত্যিকারের বিশ্বাস আর ধ্যান-ধারণা আপনার কথার মাধ্যমে প্রকাশ করুন।

পরিশেষে, একটু চিন্তা করুন তো একজন মানুষকে চেনেন না, জানেন না, তার বংশ পরিচয় বা পড়াশুনা কোন কিছুই আপনার অবগত না। তবুও মানুষটির সাথে একটু কথা বলার পরই তার সম্পর্কে একটি প্রাথমিক ধারণা আপনি করে ফেলতে পারেন। পরবর্তী সময়ে তার সাথে আপনার আচরণ কেমন হবে তার একটা পরিকল্পনা স্বয়ংক্রিয়ভাবেই আপনার মাঝে তৈরি হয়ে যায়। বলতে পারেন এর কারণ কি? এর কারণ হল তার কথা বলার ধরণ এবং অভিব্যক্তি! একজন মানুষকে তুলে ধরে তার কথা বলার ধরণ। বাহ্যিক সৌন্দর্যের একটি অন্যতম উপাদান হল সুন্দর করে কথা বলা। আমাদের ব্যক্তিত্বের একটি বড় অংশ হল কথা বলার ধরণ। সুন্দর করে কথা বলতে পারার সবচেয়ে ইতিবাচক দিকগুলো হল; আত্মবিশ্বাসী থাকা যায়, উদ্যমী হওয়া যায়, অন্যের চোখে প্রকৃত ভাবমূর্তি তৈরি করা যায়, মানুষকে সহজে প্রণোদিত করা যায়। অনেকেই আছেন খুব সুন্দর মনের মানুষ, দেখতেও অনেক সুন্দর কিন্তু তিনি ভাল কথা বললেও যিনি শুনছেন তার রাগ হয়। নিজেকে নিজে তিনি বোঝাতে পারেন না যে কী করবেন! তাই তার সব কিছুতেই অস্থির লাগে। মন ভাল হলেও তিনি ভাল মানুষ হিসেবে পরিচিতি পান না। সমাজে তার নানা ধরনের জটিলতায় পড়তে হয়। শুধুমাত্র কিভাবে সুন্দর করে কথা বলতে হয় সেটা না জানার জন্যে। তাই আসুন সুন্দর করে কথা বলি। জানেন তো সুন্দর কথা সুন্দর মনের পরিচায়ক, সুন্দর মানুষের পরিচায়ক॥

ধরিত্রি রক্ষায় আমাদের করণীয়

(৬৬ পৃষ্ঠার পর)

সচেতন হতে হবে। কারণ এই প্রাকৃতিক সম্পদগুলি সার্বিকভাবে সকলের বেঁচে থাকার জন্য গুরুত্বপূর্ণ বিধায় এসকল সম্পদ সকল সময় সামাজিক সম্পদ হিসেবে বিবেচনায় রাখতে হবে। সুতরাং এই সকল প্রাকৃতিক সম্পদ রক্ষার জন্য ব্যক্তি ও সম্বনিত দুটো উদ্যোগই গুরুত্বপূর্ণ। (৪) সঠিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনা প্রকৃতি ও পরিবেশ রক্ষার জন্য অনিবার্য বিষয়। নিত্যদিনে আমরা যা ব্যবহার করি তার মধ্যে প্লাস্টিক অন্যতম। প্লাস্টিক কখনই পঁচনশীল নয়। পঁচনশীল না হওয়ার কারণে প্লাস্টিক জলবদ্ধতা তৈরী করে। প্লাস্টিক নদীনালা খাল-বিল পেরিয়ে সর্বশেষ গন্তব্য নেয় সমুদ্রে। প্লাস্টিক পানিতে মাছের এবং অন্যান্য উদ্ভিদের ক্ষতি করে। মাটিতে প্লাস্টিক থাকলে মাটিতে অক্সিজেন চলাচল করতে পারে না এবং মাটির নিচের প্রাণী ও উদ্ভিদের ক্ষতি করে। পানির বোতলসহ অন্যান্য খাবারের মোড়কের মাধ্যমে প্রতিনিয়ত প্লাস্টিকের ক্ষুদ্র কণা আমাদের শরীরে প্রবেশ করছে। প্লাস্টিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনা করা যেমন জরুরী এবং গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ঠিক একইভাবে কলকারখানার বর্জ্য যেন আমাদের প্রাকৃতিক সম্পদ এবং পরিবেশকে ক্ষতি করতে না পারে সেজন্য তার সঠিক ব্যবস্থাপনা প্রয়োজন। **(৫)** সাধারণ জীবন যাপনে অভ্যস্ত থাকা পরিবেশের জন্য সহায়ক। ভোগ বিলাসী জীবন-যাপনই পরিবেশ বিপন্ন হওয়ার জন্য অনেকাংশে দায়ী। আরাম-আয়েশ জীবন-যাপনের জন্য ঘরে এসি, ফ্রিজ, বৈদুতিক আসবাবপত্র ব্যবহার করছি যার মাধ্যমে বাতাসে সিএফসি গ্যাসের পরিমাণ বৃদ্ধি পাচ্ছে। আমরা বাইরে গেলে ব্যক্তিগত গাড়ি ব্যবহার করছি যেখানে এসি, গ্যাস তেল সবই ব্যবহার হচ্ছে যা বাতাসে কার্বন-ডাই-অক্সাইড গ্যাসের পরিমাণ বাড়িয়ে পরিবেশকে দূষিত করে তুলছে। আমরা ব্যক্তিগতভাবে মোবাইল ও অন্যান্য প্রসাধনী ব্যবহার করছি যা উৎপাদনে জীবাশ্ম জ্বালানী ব্যবহার করা হয় এবং এই জীবাশ্ম জ্বালানীর ব্যবহার পরিবেশে মারাত্মক ক্ষতি করছে। পরিবেশ রক্ষার জন্য সংযত ও সাধারণ জীবন যাপনের বিকল্প নেই। **(৬)** ধরিত্রি রক্ষার জন্য আমাদের মানবিক হতে হবে। মানবিক বিচারবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষ কখনই ক্ষতির কারণ হয় না বরং সহযোগি ও ও যত্নশীল হয়। নৈতিক মূল্যবোধ সম্পন্ন মানুষ উন্নত চরিত্রের অধিকারী। সুতরাং একজন মানবিক এবং নৈতিক মূল্যবোধসম্পন্ন মানুষই তার কাজ ও চিন্তা-চেতনা দিয়ে ধরিত্রিকে রক্ষা করতে পারেন। সমাজে এমন মানুষ অনেক বেশি তৈরী করতে হবে নচেৎ বাস্তবিক অর্থেই পৃথিবী বিপন্ন হতে থাকবে।

বিশ্ব কবি রবীন্দ্রনাথ পরিবেশ সম্পর্কে বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেছেন " এই ধরিত্রি আমাদের, ইহার মৃত্তিকা, ইহার জল, ইহার বায়ু, ইহার আকাশ, ইহার বন, ইহার শস্য ক্ষেত্র লইয়া আমাগিকে সর্বতোভাবে বেষ্টন করিয়া আছে। আমরা যেন ভালবাসিয়া ইহার মৃত্তিকাকে উর্বরা করি, তাহার জলকে নির্মল করি, তাহার বায়ুকে নিরাময় করি, তাহার বনভূমিকে ফল ও পুষ্পবতী করিয়া তুলি, তাহার নর-নারীকে মনুষ্যত্ব লাভে সাহার্য করি।" ধরিত্রি রক্ষার জন্য পরিবেশের প্রতি মানুষের ভালবাসা ও দায়িত্ববোধের ভুমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। পরিবেশের প্রতি মানুষের সচেতন আবেগ, বিচারবুদ্ধি, বিবেক, আত্মসংযম, ও মনুষ্যত্বের সঠিক প্রকাশই আমাদের প্রিয় আবাসভূমি এই ধরিত্রিকে রক্ষা করবে যা ঈশ্বর আমাদের জন্য দিয়েছেন॥

নোভেল করোনাভাইরাস এবং পরিবার নিয়ে মণ্ডলীর ভাবনা : প্রেক্ষিত বাংলাদেশ

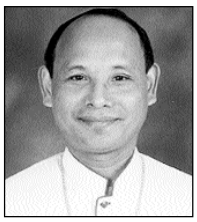

বিশপ পনেন পল কুবি সিএসসি

প্রারম্ভিকা

পরিবার হল সমাজ ও মণ্ডলীর প্রাণ। মণ্ডলীর গোড়া থেকেই অদ্যবধি পরিবার হল মণ্ডলীর অনুভূতির এবং প্রেরণ কর্মের বিশেষ একটি ক্ষেত্র। এই পরিবারকে ঘিরেই মণ্ডলী তাঁর মুক্তিকর্মের সমস্ত কার্যাবলী পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন করে আসছে। পরিবার এমন একটি সুন্দর ক্ষেত্র যেখানে সূচিত হয় ব্যক্তি মানবের সামগ্রিক জীবনের কর্মউদ্দীপনা। ঈশ্বরের সৃষ্টির সুন্দর পরিসমাপ্তি ঘটে একটি পরিবার সৃষ্টির মাধ্যমে। জগতে মুক্তির নতুন দিগন্তের সূচনা নাজারেথের একটি পবিত্র পরিবারের মাধ্যমে এবং পরবর্তীতে মণ্ডলীর পরিত্রাণদায়ী সকল কর্মপরিকল্পনা এই পরিবারকে ঘিরেই। প্রতিটি মানবসত্তা এই পরিবারেই জন্ম নেয়, বেড়ে ওঠে, হয়ে ওঠে, বিভিন্নভাবে অবদান রাখে এবং শেষে এই পরিবারের আশ্রয়ে থেকেই জীবনের শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করে। তাই পরিবার নিসন্দেহে সমাজের কোষ, মণ্ডলীর প্রাণ। তবে যুগের ও সময়ের পরিক্রমায় বিভিন্ন কঠিন সময় ও চ্যালেঞ্জর মধ্যদিয়ে যেতে হয় এই পরিবারকে। যেমন বর্তমানে চলমান বৈশ্বিক মহামারী নোভেল করোনাভাইরাসে বিপর্যস্ত পরিবারসমূহ, স্থবির পুরো পৃথিবী। করোনার মরণ ছোবলে প্রতিটি পরিবার আজ টালমাতাল হয়ে পড়েছে। প্রিয়জনদের হারিয়ে পরিবারে যেমন নেমে এসেছে শোকের কালো ছায়া, তেমনি উপার্জক্ষম মানুষটিকে হারিয়ে অসংখ্য পরিবার হয়ে পড়েছে দিশেহারা। এমন কঠিন সময়ে মণ্ডলী সবসময় পরিবারের পাশে ছিল, এখনও আছে, ভবিষ্যতেও থাকবে যেন চলমান সকল প্রতিবন্ধকতা মোকাবেলা করে পরিবারগুলো আবার নতুন আশা ও শক্তি নিয়ে ওঠে দাঁড়াতে পারে।

ভালবাসার সভ্যতা গড়ে তোলার চাবিকাঠি হল পরিবার

মণ্ডলীর চিন্তা চেতনা ও কর্মপরিকল্পনায় পরিবারের স্থান যে সর্বদাই শীর্ষে তা প্রকাশ পেয়েছে দ্বিতীয় ভাটিকান মহাসভার "বর্তমান জগতে খ্রিস্টমণ্ডলী" নামক দলিলে প্রথম অধ্যায়ে 'বিবাহ ও পারিবারিক জীবনের মর্যাদা' অনুচ্ছেদে, যেখানে পরিবার ও দাম্পত্য জীবনকে 'ঈশ্বরের আহ্বান'রূপে দেখানো হয়েছে এবং এই পরিবারের পবিত্রতা, বিশুদ্ধতা, ভালবাসা, বিশ্বস্ততাকে কিভাবে বাড়িয়ে তোলা যায় তার সম্যক নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। এর ধারাবাহিকতায় মণ্ডলী নানাভাবে প্রকাশ করেছে পরিবাবের প্রতি তাঁর আস্থা, প্রত্যাশা ও স্বপ্ন। ১৯৮১ খ্রিস্টাব্দে পুণ্যপিতা দ্বিতীয় জনপলের পালকীয় পত্র "Familiaris Consortio" যার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। ঐশপরিকল্পনার ধারক ও বাহক হিসাবে পরিবারকে আখ্যায়িত করে পরিবারে বিবাহ, প্রেম ভালবাসা ও ঈশ্বরের দান নতুন জীবনের ভূমিকা সম্পর্কে মতামত ব্যক্ত করেন এবং জীবন ও ভালবাসার সভ্যতা গড়ে তোলার কাজে পরিবারকে অগ্রণী ভূমিকা পালনে এগিয়ে আসতে পুণ্যপিতা দ্বিতীয় জন পল পরিবারগুলোকে উৎসাহিত করেন। সেই পালকীয় পত্রের বিখ্যাত উক্তি এখানে উল্লেখযোগ্য- "মানবজাতির ইতিহাস, মুক্তির ইতিহাস এই পরিবারের মাধ্যমেই এসেছে"; 'এক একটি পরিবার পবিত্রতার দরজা; ভাল ও মন্দ, জীবন ও মৃত্যু, প্রেম ও ঘৃণা- এমন দ্বিমুখী সংঘর্ষের মাঝে পরিবারগুলো পুণ্যতার পথে অগ্রসর হয়। পরিবারে পুরুষ ও নারীর বাবা ও মায়ের ভূমিকাই হল ভালবাসার সভ্যতা গড়ে তোলার চাবিকাঠি"।

পরবর্তীতে ১৯৯৪ খ্রিস্টাব্দে পরিবার বর্ষ উপলক্ষে পালকীয় পত্রে পুণ্যপিতা সাধু দ্বিতীয় জন পল পরিবারকে 'ঈশ্বরের মহারহস্য" হিসাবে আখ্যায়িত করে উল্লেখ করে বলেন- "বিবাহ সংস্কারের মাধ্যমে নারী ও পুরুষের পারস্পরিক আত্মদান, সহভাগিতা, ঐশরিক ও মানবীয় গুণাবলীর অনুশীলনের মাধ্যমে পরিবারকে গড়ে তুলবে 'গৃহমণ্ডলী'রূপে, যেখানে মাতৃস্বরূপা সর্বজনীন মণ্ডলীর সঙ্গে একাত্ম হয়ে ঈশ্বরের মুক্তিদায়ী প্রেরণকর্ম অব্যাহত রাখতে সচেষ্ট থাকবে"।

বৈশ্বিক মহামারী করোনাভাইরাস এর প্রকোপ

চলতি বছর ২০২০ খ্রিস্টাব্দের মার্চ থেকে বাংলাদেশে আঘাত হানতে শুরু করেছে কোভিদ-১৯। করোনার মারণ আঘাতে পুরো পৃথিবী বেসামাল। বাংলাদেশে করোনা রোগী শনাক্ত হয় মার্চের ৮ তারিখে। অতপর বিগত আট মাসে (মার্চ থেকে অক্টোবর) বাংলাদেশে আক্রান্তের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৩৮৪, ৫৫৯ জন, এদের মধ্যে মৃত্যু ঘটেছে ৫, ৬০৮ জনের, আরোগ্য লাভ করেছে ২৯৯,২২৯ জন (অক্টোবর ১৬, ২০২০ পর্যন্ত)। আক্রান্তের দিক থেকে দক্ষিণ এশিয়ায় বাংলাদেশের অবস্থান দ্বিতীয়, (ভারতের পরেই); বিশ্বের আক্রান্ত দেশসমূহের মধ্যে বাংলাাদেশের অবস্থান দশম স্থানে *(সূত্র: ঢাকা ট্রিবিউন, অক্টোবর ১৬, ২০২০)*। সেই মার্চ থেকেই থেমে গেছে পুরো পৃথিবী, বন্ধ করে দেয়া হয় একে একে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, শিল্পকারখানা, অফিস আদালত, দোকান, ব্যবসা বাণিজ্য; এমন কি লকডাউনের আওতায় এনে পরিবারগুলোও গৃহবন্দী হয়ে পড়ে। করোনাভাইরাস মহামারীর কারণে মানুষের জীবনে নেমে এসেছে চরম দুর্ভোগ, দুর্গতি, শঙ্কা, ভয় ও অনিশ্চয়তা। জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে করোনার প্রভাব কতটা বিস্তৃত তা এক নজরে দেখা নেয়া যাক।

১. আর্থ-সামাজিক প্রভাব

মার্চের প্রথম সপ্তাহে ঢাকার নারায়ানগঞ্জে প্রথম তিনজন ব্যক্তি করোনায় শনাক্ত হওয়ার দু'সপ্তাহ পর অর্থাৎ ২৬ মার্চ থেকে শুরু হয় সারাদেশব্যাপী লকডাউন কর্মসূচী। বন্ধ করে দেয়া হয় সকল ধরণের গণপরিবহণ, সকল সরকারি, বেসরকারি, আধা সরকারি অফিস-আদালত, ব্যবসা বাণিজ্য, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। এতে যায় সকল ধরণের লেনদেন। থেমে যায় অর্থনীতির চাকা। অচল হয়ে পড়ে জন-জীবন। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, সরকারী, বেসরকারী ও আধা সরকারি অফিস আদালত যেহেতু থেমে যায়, সেহেতু দীর্ঘসময় কর্মহীন অবস্থায় থেকে মানুষ আর্থিক চরম দুর্ভোগের সম্মুখীন হয়। করোনার গ্যাড়াকলে পড়ে অসংখ্য মানুষ তাদের চাকুরী হারায়। এ ক্ষেত্রে বিশেষ ক্ষতির সম্মুখীন মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত খেটে খাওয়া মানুষগুলো। দিন আনতে যাদের নুন ফুরায় তাদের অবস্থা দাঁড়ায় আরও করুণ। ব্র্যাকের এক জরিপে দেখা যায় যে শুধুমাত্র মার্চ থেকে মে, এই তিন মাসের ৪৫ দিনের লকডাউনে বাংলাদেশ ৫৬৫.৩৬ বিলিয়ন টাকার আর্থিক ক্ষতির সম্মূখীন হয়েছে *(সূত্র: https://www.dw.com/en/coronavirus-economy-down-poverty-up-in bangladesh/a-53759686)*। শুধু তাই নয়, এই জরিপের মতে, দেশের ৭০ ভাগই পরিবারই ছোট-খাট চাকুরী, ক্ষুদ্র ব্যবসার ওপর নির্ভরশীল। করোনাভাইরাসের কারণে আয়ের সমস্ত পথ বন্ধ হয়ে যাওয়াই সবাইকে পথে বসতে হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাস্থ্য ও অর্থনীতি বিষয়ক গবেষণা কেন্দ্রের প্রফেসর সাইদ আব্দুল হামিদ জানান, মার্চ এ্ ২৬ থেকে এপ্রিল এর ২৫ তারিখের লকডাউনে প্রতিদিন ৩৩ বিলিয়ন টাকার আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে বাংলাদেশ *(তথ্য: reports bdnews24.com.)*।

আমাদের খ্রিস্টীয় পরিবারগুলোর অবস্থাও একই দশা। আমাদের ৯০% ভাগ পরিবারের অর্থনৈতিক অবস্থা নির্ভর করে সরকারি, বেসরকারি, আধাসরকারি, গার্মেন্টস, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, শিল্প কারখানা,

বিভিন্ন ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানগুলোতে চাকুরীর ওপর। করোনাভাইরাসের কারণে সব কিছু বন্ধ হয়ে যাওয়াই পরিবারগুলোর দুর্ভোগ চরমে ওঠে। যারা স্বউদ্যোগে বিভিন্ন ক্ষুদ্র ব্যবসার সাথে জড়িত, তাদের অবস্থা আরও সঙ্গীন। পরিবারের উপার্জনক্ষম ব্যক্তিটি চাকরীহীন, বাইরে কোথাও কাজ নেই। দেখেছি সেই পরিবারগুলোর সীমাহীন দুঃখ ও কষ্ট। আয় ও উপার্জনের সমস্ত পথ বন্ধ হয়ে যাওয়ায় পরিবারগুলোকে দিন যাপন করতে হয়েছে বিভীষিকাময় এক অনিশ্চয়তা নিয়ে।

২. শিক্ষা ব্যবস্থায় করোনার আঘাত

বৈশ্বিক মহামারী নোভেল করোনাভাইরাসের আরও প্রত্যক্ষ ও ভয়ানক মরণাঘাত পৃথিবীর শিক্ষা ব্যবস্থার ওপর। মার্চের ১৭ তারিখ থেকে দেশের সকল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ করা হয় করোনার বিস্তার রোধে। এতে করে দেশের প্রায় ৪০ মিলিয়ন শিক্ষার্থী স্কুল কলেজের শিক্ষা অর্জন থেকে বঞ্চিত। নিজ নিজ পরিবারেই সময় কাটাতে হচ্ছে এসব শিশু-কিশোর ও যুব শিক্ষার্থীদেরকে। ইউনিসেফের এক তথ্যমতে, এই সংকট শুরুর পূর্বে শিক্ষার্থীদের ২৩.৯০% (৮.৪ মিলিয়ন) পরিবার দারিদ্র্যসীমার মধ্যে ছিল। দীর্ঘ সময় লকডাউনের ফলে এবং পরিবারগুলোর অভিভাবকদের চাকরি চলে যাওয়ার কারণে সেই হার দাঁড়াতে পারে ৪৩% ভাগে, অর্থাৎ প্রায় ১৬ মিলিয়ন শিক্ষার্থীদের পরিবার দারিদ্র্যসীমার নীচে চলে যেতে পারে। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ হয়ে যাওয়া মানে শুধু ছেলেমেয়েদের শিক্ষার পথ বন্ধ, তাই শুধু নয়। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর সাথে ছেলেমেয়েদের জীবনের অনেক কিছুই নির্ভর করে, যেমন- ছেলে-মেয়েদের মানবীয় গুণাবলীর অনুশীলন, মানসিক স্বাস্থ্যের সুবিকাশ, চরিত্র ও নৈতিকতা, মূল্যবোধ অনেক কিছু নির্ভর করে এই শিক্ষাজীবনের সাথে। দীর্ঘসময় ধরে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো বন্ধ হয়ে থাকার কারণে ছেলেরা সেগুলো থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। যদিও সরকারের শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে নির্দেশনা আছে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে অনলাইন শিক্ষাদান চালু করার। কিন্তু, বাস্তবতা ভিন্ন। বাংলাদেশের ন্যায় উন্নয়নশীল দেশে ঘরে ঘরে ইন্টারনেট এর মাধ্যমে শিক্ষাদান পদ্ধতি সহজসাধ্য ব্যাপার নয়। তথ্য প্রযুক্তি ও যোগাযোগের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ অনেকটা এগিয়েছে, কিন্তু বাংলাদেশের প্রতিটি পরিবারের প্রতিটি সন্তানকে অনলাইন শিক্ষার আওতায় আনতে হলে আরও অনেক ক্রোশ পথ পাড়ি দিতে হবে। প্রকৃত অর্থে ঝড় বয়ে যাচ্ছে পরিবারের পিতামাতাদের ওপর দিয়ে। এই ক্রান্তিলগ্নে, কিভাবে কোন উপায়ে সন্তানদের জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা করবে যাতে করে ছেলে-মেয়েরা সময়টাকে যথাযথভাবে ব্যবহার করতে পারে- এই চিন্তায় অভিভাবকগণ গলদঘর্ম করছেন। এখন অক্টোবর চলছে, অর্থাৎ বছরটাই শেষ হতে চলল। আবার কবে যে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো চালু হবে কোন ভরসা নেই। প্রায় পুরো বছরজুড়েই আমাদের সন্তানেরা স্কুল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে যেতে পারছে না। এই অপূরণীয় ক্ষতি কিভাবে যে সামাল দেয়া হবে, তা কেউ কোন কূল কিনারা খুঁজে পাচ্ছে না।

৩. ধর্মানুশীলন ও বিশ্বাসের ওপর করোনার প্রভাব

মহামহারী করোনার বিস্তার রোধে গৃহীত লকডাউন কর্মসূচী মানুষের আর্থ-সামাজিক শিক্ষা জীবনের চাকাই শুধু থামিয়ে দেয়নি, ধর্মানুশীলন ও বিশ্বাসের জীবনকেও করে দিয়েছে স্থবির। মসজিদ, মন্দির, গির্জা, প্যাগোডা সব উপাসনালয়ে লোক সমাগম ও জমায়েত বন্ধ হয়ে যায়। শুধু তাই নয়, ধর্মীয় প্রধান-প্রধান উৎসব উদ্‌যাপন থেকেও মানুষকে বঞ্চিত করেছে করোনা। আমাদের খ্রিস্টীয় বিশ্বাসের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, তাৎপর্যমণ্ডিত উৎসব পুনরুত্থান এবার পালিত হয়েছে গৃহবন্দী হয়েই। তবে আশা ও প্রেরণার ব্যাপার হলো এসকল ধর্মীয় উপাসনা দিতে মানুষ অংশগ্রহণ করেছে টেলিভিশন ও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমগুলোর সাহায্যে, অনলাইন ভিত্তিক উপাসনা অনুষ্ঠানগুলোতে অংশগ্রহণের মাধ্যমে মানুষ তাদের বিশ্বাস অনুশীলন অব্যাহত রেখেছে। করোনার সকল নেতিবাচক ভয়াবহ দিকগুলোর পাশাপাশি ইতিবাচক দিকটা হল মানুষকে এই বার্তা দেয়া যে প্রকৃতির কাছে আমরা অসহায়; ঈশ্বরের শক্তি ছাড়া মানুষ শক্তিহীন, নিস্ব। করোনা মহামারী আমাদের চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিল মানুষ জগতের মাপকাঠিতে যতই ক্ষমতাধর, শক্তিশালী, দুর্দণ্ড প্রতাপের অধিকারী হোন না কেন, প্রকৃতির কাছে তাকে আত্মসমর্পণ করতেই হবে। স্রষ্টার শক্তির শরণাপন্ন তাকে হতেই হবে। তাই তো গৃহবন্দী থাকার পরেও ঈশ্বরের শক্তি, সান্নিধ্য পাবার তীব্র ব্যাকুলতা মানুষ প্রকাশ করেছে বিভিন্নভাবে। খ্রিস্টীয় পরিবারগুলোতে একসাথে প্রার্থনা করার, মানত দেয়ার প্রবণতা লক্ষ্য করা গেছে। ঈশ্বরের শক্তির কাছে আত্মসমর্পণ করেছে মানুষ। বিশ্বাসের দিক থেকে হয়েছে আরও বলবান। কারো-কারো ক্ষেত্রে এর বিপরীতটাও ঘটেছে। অনেককে বলতে শোনা গেছে- ঈশ্বর কোথায়? জগতে এই যে মহামারী চলছে, কত মানুষের প্রাণ যাচ্ছে, কত পরিবার বিপন্ন হয়ে পড়েছে, সহায়-সম্বল হারিয়ে পথে বসছে- এত কিছুর পরেও স্রষ্টা কেন নীরব, নিশ্চুপ? স্রষ্টা বলে কেউ কি জগতে আছে? এই পরিস্থিতির মাঝে মন্দের ভালো দিকটা হল মানুষ স্রষ্টাকে অন্বেষণ করেছে। 'যারা স্রষ্টার অন্বেষণ করে, তারা তাঁর সন্ধান পায়' *(মথি ৭:৭)*; "যদি হৃদয় ও মন থেকে স্রষ্টার অন্বেষণ কর, তবে তুমি তাঁকে পাবেই" *(দ্বিতীয় বিবরণী ৪:২৯, প্রবচন ৮:১৭)*।

৪. পারিবারিক জীবনে করোনার প্রভাব

পরিবারকে ঘিরেই সমাজ, পরিবারকে নিয়েই মণ্ডলী। করোনার ভয়াবহতায় যে প্রতিষ্ঠানের ওপর সবচেয়ে বেশি প্রভাব বিস্তার করেছে তা হল এই পরিবার। বৈশ্বিক এই মহামারীর কারণে পরিবারের উপার্জনক্ষম ব্যক্তিটি কর্মহীন হয়ে পড়ে। এই কারনে পরিববার নিমজ্জিত হয় অথৈ আর্থিক সঙ্কটে। পরিবারের ভরণ পোষণ, ছেলেমেয়ের নানা দাবী দাওয়া পূরণ-এসবের দুশ্চিন্তা পরিবারের কর্তা-কর্ত্রীকে সর্বদা ব্যতিব্যস্ত করে তুলেছে। সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে খেটে খাওয়া পরিবারগুলো যাদের নুন আনতে ফুরায়, একদিন কাজে না গেলে যাদের উপোস থাকতে হতো সেই সব পরিবার পড়েছে আরও ভয়ানক বিপদে।

এত ঝড় ঝাঁপটা, সমস্যা, আর্থিক সঙ্কট, দৈন্য পরিস্থিতির মাঝেও ইতিবাচক একটি দিক হল লকডাউনের কারণে পরিবার একত্রিত হয়েছে। দীর্ঘসময় ধরে ঘরের বাইরে যেতে না পারায় বাবা মা উভয় পরিবারের সন্তানদের সময় দিতে পেরেছে, সঙ্গদান করেছে। সুখ-দুঃখের আলাপ হয়েছে। একসাথে খাওয়া-দাওয়া, খেলাধূলা, চিত্তবিনোদন করার অফুরন্ত সময় ও সুযোগ করে দিয়েছে বৈশ্বিক এই মহামারী। নানা সৃজনশীল সৃষ্টিশীল কাজেও মনোনিবেশ করতেও দেখা গেছে পরিবারের অনেককে। গৃহস্থালী বিভিন্ন কাজের মাধ্যমে আয়ের পথ কিভাবে সচল রাখা যায়, বিভিন্ন ক্ষেত্রে নিজেদের দক্ষতা কিভাবে বাড়িয়ে তোলা যায় সেদিকে মনোযোগ দিয়েছে পরিবারের কর্তা থেকে শুরু করে যুব-কিশোর সন্তানেরা। এর ফলে অনলাইনভিত্তিক ক্ষুদ্র ব্যবসা, ফলমূল শাক-সবজির চাষাবাদ, বৃক্ষরোপণ, হাস, মুরগী পালন নানা ধরণের উপার্জনমূলক কর্মকাণ্ডের সাথে পরিবারগুলো যুক্ত হয়, পরিবারের প্রত্যেকেই বিভিন্নভাবে অবদান রাখতে চেষ্টা করছে যা নিসন্দেহে ইতিবাচক।

৫. মণ্ডলীর নিরন্তর প্রার্থনায় ও অনুভবে পরিবারসমূহ

সময়ের পরিক্রমায় বৈশ্বিক মহামারী পরিবারে সমাজে আর্থ-সামাজিক দিক থেকে শুধু নয়, বিশ্বাসের ক্ষেত্রেও গভীর ক্ষত সৃষ্টি করছে। এ বিষয়ে মণ্ডলী তাই সর্বদা সচেষ্ট ও সচেতন। মহামারীর এই ক্রান্তিলগ্নে পুণ্যপিতা ফ্রান্সিস তাঁর এক বাণীতে সেই অভয় বাণী প্রতিটি পরিবারকে শুনিয়েছেন যে তাঁদের এই দুঃসময়ে মণ্ডলী অতীতেও পাশে ছিল, বর্তমানেও আছে এবং ভবিষ্যতেও থাকবে। পুণ্যপিতা ফ্রান্সিসের আহ্বান-মহামারীর এই ক্রান্তিলগ্নে পরিবারগুলো যেন খ্রিস্টের প্রতিশ্রুত পরিত্রাণ ও নিরাময়, শান্তি ও ন্যায়ের রাজ্যের প্রত্যাশায় বুক বাঁধে, বিশ্বাস ও মনোবলকে সুদৃঢ় রাখে। মণ্ডলীর ঐতিহ্যমতে, অনুভূতি বা মনোভাবের চেয়ে বিশ্বাস, আশা ও প্রেমের মাধ্যমেই খ্রিস্টের সাক্ষ্য বহন সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। এই তিন

ঐশগুণ পরিবারকে নিরাময় দান করে, পরিবারের প্রত্যেককে নিরাময়কারী করে তোলে অপরের সেবার নিমিত্তে”। মঙ্গলসমাচারীয় আশা, বিশ্বাস ও প্রেমের সাথে নবীকৃত সম্পর্ক পরিবারসমূহকে নতুন প্রেরণা দান করে, যার মাধ্যমে পরিবার, সমাজ ও জগতের মধ্যকার একতা বিচ্ছেদকারী ধ্বংসাত্মক, ভীতিজনক দিকগুলো উন্মোচিত হয় এবং নতুন চেতনা, আশা নিয়ে পথ চলার প্রেরণা লাভ করে।

আমরা যেন কখনও ভুলে না যাই যে যিশু সর্বদাই আমাদের ডাকে সাড়া দেন, খুব দ্রুত এবং প্রয়োজনীয় মুহূর্তেই তিনি সাড়া দেন। তাঁর দয়া তাদের জন্য অফুরন্ত যারা অন্যের প্রতি দয়া প্রদর্শন করে; তাঁর প্রেম সীমাহীন, যারা অন্যের প্রতি প্রেম প্রদর্শন করে। তিনি দয়া করেন, পাপের ক্ষমা দেন, জীবনকে নতুন করে সাজান। বৈশ্বিক মহামারী নোবেল করোনাভাইরাস এর ভয়াবহতার সময় খ্রিস্টের সেই সীমাহীন দয়া, অনুগ্রহ ও ভালবাসার অভিজ্ঞতা আমরা লাভ করেছি বিভিন্নভাবে।

৬. করোনাকালে পরিবারের কাছে খ্রিস্টের মণ্ডলীর সাক্ষ্যদান

মহামারী রোধে এবং পরিবারগুলোর নিরাপত্তা এবং স্বাস্থ্য ও সুরক্ষার নিমিত্তে যিশু খ্রিস্ট কর্তৃক স্থাপিত মণ্ডলী বিভিন্ন কর্মসূচীর মাধ্যমে মঙ্গলসমাচারীয় দয়া ও ভালবাসার সাক্ষ্য বহন করে আসছে। প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে মণ্ডলী পরিবারগুলোর পাশে দাঁড়িয়েছে, সেবা সুশ্রুষা করেছে, সাহস যুগিয়েছে, অভয় বাণী শুনিয়েছে, অবিরাম প্রার্থনা করেছে। কঠিন লকডাউনের সময় মণ্ডলী তাঁর হৃদয় দ্বার উন্মুক্ত রেখেছে। গির্জাঘর, প্রার্থনার গৃহগুলোতে গণ সমাগম বন্ধ থাকলেও মণ্ডলী তাঁর সংস্কারীয় সেবাকাজ অব্যাহত রেখেছে। পরিবারের জন্য প্রার্থনা, রোগীকে পাথেয় সংস্কার দান, মৃতের সৎকার, অনলাইন উপাসনা- তথা সম্ভাব্য সকল ধরণের সেবা দিয়ে আসছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ও সরকারের সকল নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্যবিধিমেনেই। স্বাস্থ্যঝুঁকি নিয়েও বাড়ি বাড়ি খাদ্যসামগ্রী পৌঁছে দিতে সর্বদা সচেষ্ট, আন্তরিক ও যত্নবান ছিল। এই কাজে সমাজের বিত্তবান লোকদের ত্যাগস্বীকার মণ্ডলী কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করছে। সমাজের বিত্তবান লোকেরা, বিভিন্ন সেবা দাতাসংস্থা ও সমিতির উদ্যমী নেতৃবৃন্দ ও খ্রিস্টভক্তগণ মিলিত হয়ে নিরলসভাবে, জীবনের ঝুঁকি নিয়ে অসহায়, দরিদ্র, নিস্ব পরিবারগুলোতে খাবার, পানীয়, ঔষুধপত্র, মাস্ক, স্যানিটাইজারসহ যাবতীয় নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি পৌঁছে দিয়েছে। সকল ধর্মপল্লীর প্যারিশ কাউন্সিল, ফাদার, সিস্টারগণ ভক্তজনগণের সাথে একাত্ম হয়ে সেবাদানের কার্যক্রম সচল ও অব্যাহত রেখেছেন যা নিসন্দেহে প্রশংসার দাবীদার। এ যেন মণ্ডলীর সামাজিক শিক্ষা ‘কম্পেনডিয়াম’ এ বর্ণিত মঙ্গলসমাচারীয় বিভিন্ন মূল্যবোধ ও নীতিমালার বাস্তবায়ন; যেখানে উল্লেখ আছে- মানব ব্যক্তির মর্যাদা, জনকল্যাণ, দারিদ্র্য কল্যাণ, মানব জীবনের চূড়ান্ত লক্ষ্য, একাত্মতা, পারস্পরিক সাহায্য, ধরিত্রী কল্যাণ প্রভৃতি নীতির আলোকে সমাজের নেতৃবৃন্দ বৈশ্বিক এই মহামারীর ক্রান্তিলগ্নে একত্রে বেড়ে ওঠার প্রাণান্ত প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে বদ্ধপরিকর হবেন, যাতে প্রকাশ পাবে মঙ্গলসমাচারীয় তিন ঐশ গুণ বিশ্বাস, আশা ও প্রেম।

৭. আমরা সকলে ভাই... ফ্রাতেল্লি তুত্তি

কোভিড-১৯ তথা নোভেল করোনাভাইরাসের মধ্যক্ষণে পুণ্যপিতা ফ্রান্সিস তাঁর তৃতীয় পালকীয় পত্র এই অক্টোবরের ৩ তারিখে প্রকাশ করেন যা ‘ফ্রাতেল্লি তুত্তি’ নামে পরিচিত, বাংলায় তর্জমা করলে যার অর্থ দাঁড়ায় ‘সকল ভ্রাতৃগণ’ (Brothers All-Fratelli Tutti)। এই পালকীয় পত্রের উদ্দেশ্য কি? বৈশ্বিক মহামারীর এই ক্রান্তিলগ্নে পুণ্যপিতা ফ্রান্সিস বিশ্ববাসীর কাছে কি বার্তা দিলেন? সবার মনে নিশ্চয় এই প্রশ্নগুলো ঝড় তুলছে। মূলত এই পালকীয় পত্রের মাধ্যমে পুণ্যপিতা বিশ্ববাসীর কাছে যে বার্তা তুলে ধরেছেন তা হল- পরিবার হল একটি জায়গা যেখানে সুখ আনন্দের পাশাপাশি অবিরাম নানা ধরণের দুঃখের, কষ্টের, সমস্যার, চ্যালেঞ্জের ঝড় বয়ে যায়। এই ঝড় মোকাবেলার জন্য পরিবারের চেয়ে উত্তম জায়গা আর নেই। কেননা, এই পরিবারেই একে অপরকে সাহায্যের জন্য আছেন পরিবারের বাবা, মা, ভাই-বোনসহ আরও অন্য সকলে। ফ্রাতেল্লি তুত্তির সপ্তম অধ্যায়ে বিশেষভাবে পুণ্যপিতা পুনরায় উল্লেখ করেছেন সেই বক্তব্য যা তিনি বলেছিলেন ইকুয়েডরে ২০১৫ খ্রিস্টাব্দের এক পালকীয় সফরে। তিনি বলেছেন- পরিবারের পিতামাতা, দাদা-দাদী ও সন্তানদের মধ্যকার চমৎকার বোঝাপড়া থাকে। পরিবারের কেউ যত বড় সমস্যার মধ্যেই থাকুক না কেন, সকলে মিলে সমাধানের চেষ্টা করে; একজনের সমস্যা পরিবারের সকলের হয়ে পড়ে। পরিবারে মাঝে ঝগড়াঝাটি, মনোমালিন্য থাকতে পারে, কিন্তু পরিবারের সার্বিক কল্যাণে সকলেই সেই মনোমালিন্য ভূলে গিয়ে সমবেতভাবে অবদান রাখার চেষ্টা করে। পরিবারের কারোর ব্যক্তিমর্যাদা ক্ষুন্ন করে নয়, বরং একে অপরকে উৎসাহিত ও সমর্থন করে। খ্রিস্টীয় পরিবারের সৌন্দর্য এখানেই। এমনটিই হওয়া উচিত” *(অনুচ্ছেদ নং-২০৩)*। করোনার এই বৈশ্বিক মহামারীর ক্রান্তিকালে প্রতিটি পরিবারে ঠিক সেরকম একতা, সমঝোতা, বোঝাপড়া, পারস্পরিক সাহায্য-সহযোগিতার মনোভাব থাকা একান্ত আবশ্যক। সম্মিলিতভাবে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করতে না পারলে বর্তমান চলমান চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করা সম্ভব নয়।

অনেকের মতে, করোনার নেতিবাচক ভয়াবহ অনেক দিকগুলোর মধ্যে কিছু ইতিবাচক দিকও রয়েছে। যেমন- এই করোনা পরিবারকে একত্রিত করেছে। দীর্ঘসময় লকডাউনের কারণে পরিবারের প্রত্যেক সদস্যকে পরিবারে অবস্থান করতে হয়েছে। এতে করে পরিবারের প্রত্যেক সদস্য-সদস্যা একে-অপরের সান্নিধ্য লাভ করার সুযোগ পেয়েছে। বাবা-মা পরিবারের সন্তানের সাথে খেলছে, সঙ্গ দিচ্ছে, একসাথে খাবার খাচ্ছে, ভাগ করে নিচ্ছে, একসাথে প্রার্থনা করছে, পরস্পরের দুঃখ-কষ্ট ভাগ করে নিচ্ছে যা সত্যিই প্রয়োজন ছিল। বর্তমান ব্যস্তময় সূচিতে পরিবারের জন্য এমনভাবে সময় ও সঙ্গদান সত্যিই কঠিন কাজ। এই কঠিন কাজটাকে সাধ্য ও সম্ভব করে দিয়েছে এই করোনা ভাইরাস। পরস্পরকে জানার, বুঝার, কাছে আসার, সহভাগিতা-সহমর্মিতা প্রকাশের এই সুবর্ণ সুযোগ পরিবারের প্রত্যেকেই কাজে লাগিয়েছে নিশ্চয়ই।

উপসংহার

সৃষ্টির গোঁড়া থেকেই ঈশ্বরের মহান পরিকল্পণার পুরোটা জুড়েই মানুষের সার্বিক কল্যাণ ও পরিত্রাণ নিহিত। ঈশ্বর কখনও তাঁর সৃষ্টির অকল্যাণ চান না। ”হে পিতা, তুমি আমার হাতে যাদের তুলে দিয়েছ, আমি তাদের কাউকেও হারাতে দিইনি, এইতো তুমি চেয়েছিলে” *(যোহন ৬:৩৯, ১৮:৯)*। নবেল করোনা পরিবারের অনেক ক্ষতি সাধন করেছে সত্য, কিন্তু এর মাধ্যমে ঈশ্বরের পরিকল্পণাকে আমরা যেন গভীরভাবে উপলব্ধি করতে পারি। সোশ্যাল ডিসটেন্স বা সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখার স্লোগান এখন চারিদিকে, কিন্তু এই সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখতে গিয়ে আমরা যেন ঈশ্বরের সাথে দূরত্ব সৃষ্টি না করি; বরং ঈশ্বরের আরও কাছাকাছি থেকে, ঈশ্বরের সাথে গভীর সম্পর্ক স্থাপন করতে আমরা যেন আপ্রাণ চেষ্টা করি। কেননা, পৃথিবীর মানুষ আজ ভয়ানকভাবে অভিজ্ঞতা করেছে, টাকা, পয়সা, ধন দৌলত, চাকচিক্যময় বাড়ি-গাড়ি, ব্যাংক ব্যালেন্স, রাজা, বাদশা, প্রধানমন্ত্রী, উজির ফকির- কেউ করোনার কাছ থেকে বাঁচতে পারেনি। প্রকৃতির কাছে মানুষ কত অসহায়। ঈশ্বরের শক্তি ব্যতিরেকে আমরা মানুষ কত দুর্বল, কত ভঙ্গুর, কত অসহায়। আসুন, ঈশ্বরের শক্তির ওপর নির্ভর করে, তাঁর উপর বিশ্বাস রেখে পরিবার, সমাজ, মণ্ডলী তথা মাতৃস্বরূপা এ ধরিত্রীর কল্যাণার্থে এক পরিবার হয়ে, কাঁধে কাঁধ রেখে, হাতে হাত রেখে কাজ করি।

তথ্যসূত্র:

১. *দ্বিতীয় ভাতিকান মহাসভার দলিলসমূহ: বর্তমান জগতে খ্রিস্টমণ্ডলী*
২. *ফ্রাতেল্লি তুত্তি, পুণ্যপিতা ফ্রান্সিসের পালকীয় পত্র, অক্টোবর ৩, ২০২০ খ্রিস্টাব্দ*
৩. *লাউদাতো সি, পুণ্যপিতা ফ্রান্সিসের পালকীয় পত্র, জুন ১৮, ২০১৫ খ্রিস্টাব্দ*
৪. *পরিবারের কাছে পুণ্যপিতা দ্বিতীয় জন পলের পত্র, ফেব্রুয়ারি, ১৯৯৪ খ্রিস্টাব্দ*
৫. *repots bdnews24.com*

বাংলাদেশে ওয়াইসিএস আন্দোলনের গোড়াপত্তনের স্মৃতি ও বর্তমান কিশোর কিশোরীদের নিয়ে ভাবনা

শিউলী রোজলিন পালমা

১৯৮০ খ্রিস্টাব্দের কথা, তখন আমি তুমিলিয়া সেন্ট মেরীস গার্লস হাই স্কুলের ৮ম শ্রেণীর ছাত্রী। অক্টোবর মাসের শুরুতে পূঁজার ছুটির কয়েকদিন আগে আমাদের শ্রদ্ধেয় শিক্ষক সিস্টার মেরী প্রফুল্ল এসএমআরএ আমাকেসহ আমার দুই বান্ধবীকে (সুষমা শিশিলিয়া পিউরীফিকেশন ও মেরী মাগ্রেট পিউরীফিকেশন) ডাকলেন। তিনি জানালেন পূজার ছুটিতে ঢাকায় একটি সম্মেলনের আয়োজন করা হয়েছে, সে সম্মেলনে যোগ দিতে আমাদের তিনজনকে নিয়ে যাওয়া হবে। সিস্টার নিজে আমাদের নিয়ে যাবেন, আমরা যেন বাড়িতে ব্যাপারটি জানিয়ে অনুমতি নিই। যেহেতু সিস্টার নিজে আমাদের নিয়ে যাবেন তাই কাজটি নিসন্দেহে খুবই ভাল ভেবে কারো বাড়ি থেকেই অনুমতি পেতে সমস্যা হলো না। নির্ধারিত দিনের বিকেলে আমরা তুমিলিয়া বোর্ডিং-এ এসে রাতে থাকলাম এবং পরের দিন ভোরের ট্রেনে ঢাকায় রওনা হলাম। সম্মেলন হবে বটমলী হোম স্কুলে, যেহেতু সম্মেলন শুরু বিকেলে তাই সকালের সময়টুকু সিস্টার আমাদের হলিক্রস কলেজ, তেজগাঁও গির্জা ও জাগরণী ক্রাফট সেন্টার ঘুরিয়ে দেখালেন।

বিকাল হতেই বিভিন্ন স্কুল থেকে একজন করে শিক্ষকসহ ছেলেমেয়েরা আসতে লাগলো। আরো অনেক ফাদার সিস্টার ও বয়োজ্যেষ্ঠ গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিবর্গ ধীরে ধীরে উপস্থিত হলেন। সবার নাম রেজিস্ট্রি হচ্ছে। বিভিন্ন গ্রুপকে তাদের থাকার ঘর দেখাতে নিয়ে যাচ্ছেন শিক্ষকগণ। সবাই যার যার ব্যাগ নিয়ে যাচ্ছে শিক্ষকদের পিছন পিছন। বেশ হৈচৈ। এই প্রথম পরিবারের কাউকে ছাড়া একা এত দূরে এসেছি, এত অজানা অচেনা মানুষ, নানারকম কথাবার্তা কিন্তু আমার কোন ভয় বা খারাপ লাগছিল না। খুবই ভাল লাগছিল। কী জানি একটা নতুনত্বের আনন্দ!

আমাদের কক্ষে আমরা নয়জন ছিলাম, তুমিলিয়ার তিনজন, পানজোরা হাই স্কুলের তিনজন এবং গোল্লা স্কুল থেকে আসা তিনজন। সন্ধ্যায় সম্মেলনের শুভ উদ্বোধন হল। এখানে উল্লেখ্য যে এই সম্মেলনের মধ্যদিয়েই বাংলাদেশে ণঈঝ আন্দোলনের যাত্রা শুরু হয় এবং আমি নিজেকে অত্যন্ত সৌভাগ্যবান মনে করি যে, সে সম্মেলনে আমি একজন অংশগ্রহণকারী ছিলাম। উদ্বোধনের পর অনুষ্ঠিত হল পরিচিতি পর্ব। পরিচিতি পর্বের পর আমরা আমাদের নাম একটি ছোট কাগজে লিখে একটি বক্সে জমা রাখলাম এবং পরে আবার একটি করে কাগজ বক্স থেকে তুলে নিলাম। আমাদের বলা হল তুলে নেয়া কাগজে যার নাম লেখা থাকবে সে হবে আমার গোপন বন্ধু। সম্মেলনের পুরো তিনদিন গোপন বন্ধুকে নানাভাবে সাহায্য করতে হবে, আনন্দ দিতে হবে এবং শেষদিন প্রকাশ করা হবে গোপন বন্ধুর নাম। গোপন বন্ধুর খেলা দিয়েই শুরু হয়ে গেল কিশোর হৃদয়ে অন্যকে সহযোগিতা করার বা আনন্দ দেয়ার অনুশীলন।

পরের দিনটা শুরু হয় খ্রীষ্টযাগের মধ্যদিয়ে। খ্রীষ্টযাগের পর নাস্তা সেরে আমরা যোগ দিই মূল অধিবেশনে। এই অধিবেশনে আমরা জানতে পারি বিশ্বব্যাপী ণঈঝ আন্দোলনের এর কথা, YCS আন্দোলনের উদ্দেশ্য এবং বাংলাদেশে এই আন্দোলনের শুরু করার প্রয়োজনীয়তার কথা। বিভিন্ন বক্তব্য, দলীয় আলোচনা ও খেলাধূলার মধ্যদিয়ে আমাদের বোঝানো হয় YCS কী এবং কীভাবে এর সাথে সম্পৃক্ত হয়ে স্কুল পড়ুয়া কাথলিক ছেলেমেয়েরা গঠন পাবে। স্কুল পড়ুয়া ছেলেমেয়েরা নিজেদের সমস্যাগুলো, চ্যালেঞ্জগুলো নিয়ে কীভাবে নিজেদের মধ্যে আলাপ করবে এবং ধর্মীয় ও বাইবেলের শিক্ষার আলোকে কীভাবে সমস্যাগুলো মোকাবেলা করা যায় তার উপায় তারা নিজেরাই খুঁজে বের করবে। হোক তা ছোট অথবা বড়। মোটকথা এই আন্দোলনের মধ্যদিয়ে এটাই চাওয়া হয় যেন স্কুল জীবন থেকেই কাথলিক ছেলেমেয়েরা অন্যের সমস্যায় সহানুভূতিশীল হয়, দয়ার কাজে উদ্বুদ্ধ হয়, অন্যের জন্য ত্যাগস্বীকারের অনুশীলন শুরু করে, ত্যাগ ও সেবার আনন্দ বুঝতে পারে এবং ধর্মচর্চায় অভ্যস্ত হয়। YCS আন্দোলনের অন্যতম চাওয়া ছেলেমেয়েদের আত্মকেন্দ্রিকতা ও উদাসীনতারোধ। ছেলেমেয়েরা যেন অন্যের প্রয়োজন, বিপদ ও কষ্ট দেখতে, বুঝতে ও অনুভব করতে শিখে এবং তারা যেন অন্যের কষ্ট লাঘবে উদ্যোগ নেয়। সে উদ্যোগ খুবই ক্ষুদ্র হতে পারে। কিন্তু শুরুটা যেন হয়।

এ সম্মিলনে অংশ নিয়ে আমি প্রথম শিখেছিলাম আত্মবিশ্বাস জাগরণমূলক বিখ্যাত গানটি- “আমরা করব জয়, আমরা করব জয়, আমরা করব জয় একদিন। ও বুকের গভীরে আমরা জেনেছি, আমরা করব জয় একদিন।” বাংলা ইংরেজি দুভাবেই গানটি গাইতে আমাদের শিখানো হয়েছিল। সেই সম্মেলনে একেক সেশনে আমাদের একেকভাবে উদ্দীপ্ত করা হয়েছিল, যেমন- আমাদের স্বপ্ন কী? আমার জীবনের কোন অর্জন আমাকে সবচে বেশি আনন্দ দেয়? তখন ছোট ছিলাম বিষয়গুলো পুরোপুরি আত্মস্থ করতে পারিনি কিন্তু এখন পরিণত বয়সে এসে বুঝি উদ্যোগগুলি খুবই ভালো ছিল। আমাদের জীবনের ভাল অর্জনগুলোর সংখ্যা বাড়াতে-বাড়াতে একটা বড় স্বপ্নকে যেন ছুঁতে পাড়ি সেই উদ্দীপনা জাগানোরই চেষ্টা করা হয়েছিল। আমার মনে হয় আমি এখন যেভাবে চিন্তা করি বা যেভাবে কাজ

করি এবং সামাজিক দায়িত্ববোধ যতটুকু আমার মধ্যে গড়ে উঠেছে তার পিছনে ছোটবেলার বিভিন্ন উদ্দীপনামূলক কার্যক্রমের (YCS, পুষ্প সংঘ, গার্লস গাইড) একটা বড় ভূমিকা আছে। আমি কৃতজ্ঞ আমার শিক্ষকদের প্রতি যারা আমার জন্য এই সুযোগসমূহ সৃষ্টি করেছিলেন।

সে সম্মেলনে আমাদের নিজেদের কাজগুলো নিজেদের করতে শেখানো হয় যেমন নিজেদের থাকার রুমটি গুছিয়ে রাখা, খাবার পর নিজের প্লেট, গ্লাস, কাপ, পিরিচ ধুয়ে নির্ধারিত জায়গায় রাখা। একেক সেশনে একেক জনকে সভাপতিত্ব করতে বা মিনিটস্ নিতে দেয়া হতো, এভাবে আমাদের সাহস বাড়াতে বা দায়িত্ববান হতে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছিল। আজ থেকে ৪০ বছর আগের সে সম্মেলনে অংশগ্রহণকারী ও আয়োজকদের সবার কথা মনে না থাকলেও অনেকের কথা আমার মনে আছে। তাদের কারো-কারো সাথে পরবর্তীতে আমার শহুরে জীবনে দেখা হয়েছে, কথা হয়েছে। সেই ইতিহাসের সাথে সম্পৃক্ত মানুষগুলো যাদের কথা আমার মনে আছে তাদের নাম এ লেখায় উল্লেখ করলাম যদিও কারও-কারও পদবী আমার মনে নেই। শ্রদ্ধেয় নির্মল গমেজ, টেরেন্স পিনেরু, সিস্টার পলিন গমেজ সিএসসি, সিস্টার মেরী পেট্রা এসএমআরএ, সিস্টার প্রফুল্ল এসএমআরএ, ফাদার টনি সিএসসি, সন্তোষ হিউবার্ট কস্তা, রোজলিন গমেজ, প্রতিমা রোজলিন গমেজ, মিনতি গমেজ, এডমন্ড অমল গমেজ, বির্জিনিয়া গমেজ, ফিতালিশ, এনিটা, ড. বাবলি বৃজেট গমেজ, মার্কাস গমেজ, সুবীর রোজারিও, ডমিনিকা রোজারিও, এলিজাবেত, ঝিনা ডি' কস্তা, বীনা ডি' কস্তা, মেরী মাগ্রেট, সুষমা শিশিলিয়া, সীমা রড্রিক্স, রীনা, শিউলী গমেজ, ঝর্ণা, কল্যাণী গমেজ। যাদের কথা আমার মনে নেই তাদের প্রতি রইল আমার অকৃত্রিম শ্রদ্ধা।

সম্মেলন চলাকালে এইচএসসি পরীক্ষার রেজাল্ট বের হয়েছিল এবং অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে তিনজন ছিলেন পরীক্ষা দিয়েছিলেন। এদের মধ্যে বির্জিনিয়া গমেজ ও এডমন্ড অমল গমেজ বিজ্ঞান বিভাগ থেকে প্রথম বিভাগে পাশ করেছিলেন এবং ফিতালিশ বাণিজ্য বিভাগ থেকে দ্বিতীয় বিভাগে পাশ করেছিলেন। তাদের ভালো ফলাফলে সবাই অনেক খুশী ছিল এবং এই তিনজন সব অংশগ্রহণকারীদের মিষ্টি খাইয়েছিলেন। এ ঘটনা সম্মেলনে একটা ভিন্ন মাত্রার আন্তরিক পরিবেশ এনে দেয়।

আয়োজকদের মধ্য থেকে দুজনের কথা বিশেষভাবে মনে পড়ছে, একজন হলেন প্রয়াত হিউবার্ট সন্তোষ কস্তা, যিনি কারিতাস বাংলাদেশে কর্মরত ছিলেন। হিউবার্টদা তার মজার কথা দিয়ে সবাইকে মাতিয়ে রাখতেন এবং লাঞ্চ বা টি ব্রেকের পর সবাইকে আবার অডিটোরিয়ামে ফিরিয়ে আনতে দরাজ গলায় গান শুরু করে দিতেন। গানটি হল- "তোমায় ভালবেসেছি, প্রভু তোমায় জীবন দিয়েছি।" পরবর্তীতে হিউবার্টদা কারিতাস ঢাকা অঞ্চলের আঞ্চলিক পরিচালক ছিলেন। অন্যজন হলেন প্রয়াত নির্মল গমেজ, তিনিও কারিতাস বাংলাদেশে কর্মরত ছিলেন, নির্মলদা সার্বক্ষণিকভাবে সম্মেলনে থাকতেন না তবে দিনে একবার মোটরসাইকেল নিয়ে আসতেন। নির্মলদা যখন আসতেন তিনি আমাদের তিনজনের (মেরী সুষমা ও আমি) খোঁজ নিতেন, আমাদের কোন সমস্যা হচ্ছে কিনা জানতে চাইতেন এবং অনেক কিছু বলে আমাদের হাসাতেন। আমরা ঠিক বুঝতে পারছিলাম না ব্যাপারটা কী? কেন উনি আমাদের সাথে হাসিঠাট্টা করেন। বুঝলাম শেষ দিন, যখন গোপন বন্ধুর নাম প্রকাশ হলো। দেখা গেলো নির্মলদার গোপন বন্ধু আমাদের মেরী। এখন ভেবে বিস্মিত হই সত্যি উনি এত বড় মানুষ হয়েও, শত ব্যস্ততার মাঝেও তার ছোট্ট গোপন বন্ধুর প্রতি কত দায়িত্বশীল আচরণ করেছিলেন। পরবর্তীতে কারিতাস বাংলাদেশের উন্নয়ন পরিচালক এবং মটস্-এর পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন।

সম্মেলনের শেষদিন অংশগ্রহণকারীদের অংশগ্রহণে বিচিত্রানুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। সেখানে মেরী ও আমি নাচ করেছিলাম, নাচের গানটি ছিল- "সীমানা ছাড়িয়ে গাঁ, পেরিয়ে হু হু হু হু, আমরা যাব বহুদূরে হা হা হা হা ।" নাচ ছাড়াও আমি কাজী নজরুল ইসলামের 'লিচু চোর' কবিতাটি আবৃত্তি করেছিলাম। এ আবৃত্তি আমাকে শিখিয়েছিলেন আমার শ্রদ্ধেয়া শিক্ষিকা সি. মেরী অমিয়া এসএমআরএ।

মনে প্রাণে এক অদ্ভুত আনন্দ, ভাললাগা ও নবচেতনা নিয়ে সম্মেলন শেষে আমরা স্কুলে ফিরি। আমাদের সম্মেলনের অভিজ্ঞতা স্কুলের সব ছাত্র-ছাত্রীদের সাথে সহভাগিতা করে এবং শিক্ষকগণের সহায়তায় স্কুলে YCS এর কার্যক্রম শুরু হয়। ঢাকায় কেন্দ্রীয় সম্মেলন আয়োজনের বছরখানেকের মধ্যে স্থানীয়ভাবে আরো সম্মেলনের আয়োজন করা হয় এবং স্থানীয় আরো বেশিসংখ্যক ছাত্রছাত্রীকে ণঈঝ আন্দোলনের সাথে যুক্ত করা হয়। যেমন আমাদের সেন্ট মেরীস গার্লস হাইস্কুল, তুমিলিয়াতে একটি সম্মেলন হয়েছিল যেখানে ভাওয়াল এলাকার বিভিন্ন স্কুলের শতাধিক ছাত্রীর অংশগ্রহণ ছিল। ভাওয়াল এলাকার ছেলেদের জন্য এধরণের একটি সম্মেলন সেন্ট নিকোলাস স্কুলে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। সেসময় আমরা সেল মিটিংগুলোতে বাইবেল পাঠ, পাঠের ওপর অনুধ্যান, দয়ার কাজের জন্য দান সংগ্রহ, প্রায়শ্চিত্তকালে বিশেষ প্রার্থনার আয়োজন ইত্যাদি ছোট-ছোট কাজ করতাম। এখন সময়ের পরিবর্তনের সাথে সাথে কিশোর-কিশোরীদের সমস্যা ও চ্যালেঞ্জ অনেক বেড়েছে তাই বর্তমান সময়ে কিশোর কিশোরীদের চ্যালেঞ্জগুলো মোকাবেলায় YCS এর সক্রিয় ভূমিকা আরো অনেক বেশি প্রয়োজন।

আমাদের কিশোররা এখন অন্য অনেক সময়ের চেয়ে বেশি বিভ্রান্তিকর সময় পার করছে। আগে শিশু কিশোররা পাড়া প্রতিবেশী শিশু কিশোরদের সাথে খেলাধুলা করতে করতে বড় হত। স্কুল ছুটি হলে মামা, মাসী, পিসির বাড়ি বেড়াতে যেত, সেখানেও মামাতো, মেসোতো ও পিসাতো ভাই-বোনদের সাথে খেলাধূলায় সময় কাটাতো। ভালো রেজাল্ট নিয়ে খুব বেশি চাপ থাকতো না। ছোট ভাইবোনরা বড় ভাইবোনদের অনুসরণ করতো। এভাবেই শিশু কিশোরদের সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়া শুরু হত। গুরুজনেরা আদরে শাসনে শিখিয়ে দিত সামাজিক রীতি নীতি, প্রথা ও ধর্মচর্চা।

সে পরিবেশ এখন আর নেই। এখন ভাইবোনের সংখ্যা কম, মাসী পিসির সংখ্যা কম, আত্মীয়-স্বজনের বাড়ি যাতায়াত কম। পরিবারের আর্থিক সচ্ছলতা নিশ্চিত করতে সবাই ব্যস্ত সময় পার করছে। আগে খেয়ে না খেয়ে পরিবারগুলো একসাথে থাকতো, এখন

একটু ভাল থাকার জন্য শহরে আসছে। শহরে ছোট্ট ঘরে পরিবার নিয়ে থাকতে হচ্ছে ফলে শিশুরা সুষ্ঠুভাবে বেড়ে উঠার পরিবেশ পাচ্ছে না, শেখা হচ্ছে না সামাজিক মূল্যবোধ, ধর্মচর্চার বালাই নেই, গঠন পাচ্ছে না পরিপূর্ণ মানুষ হিসেবে বিকশিত হবার। বাবা-মা দুজনই দীর্ঘ সময় বাইরে থাকছে পেশাগত প্রয়োজনে, আর শিশু-কিশোররা ঘরে থাকে একা, নিরাপত্তাহীন ও অবহেলিত হয়ে। বাবা মা বাচ্চাকে উপযুক্ত স্নেহ শাসন করার সময় পাচ্ছে না, কাদের সাথে বন্ধুত্ব হচ্ছে তার খোঁজ নেয়া হচ্ছে না, কি করে তারা সময় কাটাচ্ছে তা জানার চেষ্টা করা হচ্ছে না। আর পরিবারের এই অমনোযোগীতার সুযোগেই শিশু-কিশোররা আটকে যাচ্ছে আকাশ সংস্কৃতি ও অনলাইন প্রযুক্তির বেড়াজালে। শিশু-কিশোরদের বই পড়ার অভ্যাস এখন মারা যাওয়ার পথে তারা তাদের জীবনের মূল্যবান সময় নষ্ট করে ফেলছে মাত্রাতিরিক্ত গেম গেলে, ইউটিউবে নানা বিভ্রান্তিকর ভিডিও দেখে। একদল মুনাফালোভী মানুষ নানা আর্কষণীয় টাইটেল দিয়ে অশ্লীল, নীতি বিবর্জিত, বির্তকিত ও অপ্রয়োজনীয় ভিডিয়ো বানিয়ে ইউটিউবে ছেড়ে দিচ্ছে। আর আমাদের কিশোররা বুদ হয়ে সেগুলো দেখছে। এসব ভাওঁতাবাজিতে পূর্ণ ভিডিয়ো দেখে তারা কিছুই শিখছে না বরং তাদের বিশুদ্ধ জ্ঞানর্চচার আগ্রহ অঙ্কুরেই নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। উল্টো তাদের মধ্যে অঙ্কুরিত হচ্ছে অপরাধপ্রবণতা ও সমাজবিরোধী মনোভাব। এখন তো পত্রিকা খুললেই আমরা দেখি উঠতি বয়সের কিশোরদের "গ্যাং কালচার"-এর খবর এবং তাদের মাধ্যমে সংঘঠিত নানা ভয়ংকর অপরাধের কাহিনী। এধরনের ভয়ংকর পরিণতি থেকে আমাদের কিশোরদের রক্ষা করতে হলে পরিবারকে হতে হবে অত্যন্ত সচেতন, কঠোর নিয়ন্ত্রণ আনতে হবে প্রযুক্তি ব্যবহারে।

আমি মনে করি, অন্ততপক্ষে আমাদের কাথলিক কিশোর-কিশোরীদের অনলাইনের এই মরণছোবল থেকে রক্ষার জন্য ণঈঝ একটা শক্তিশালী ভূমিকা পালন করতে পারে। অনেক বড়-বড় মহামানব ও জ্ঞানীগুণী মানুষের জীবনী পাঠ থেকে জেনেছি যে শৈশবে তারা কোন পন্ডিত ব্যক্তির সাহচর্য পেয়েছেন। যিনি (পন্ডিত ব্যক্তি) তাদেরকে নানাভাবে (গল্প বলে, কাজ করিয়ে, বই পড়তে দিয়ে, বেড়াতে নিয়ে) মূল্যবোধ ও দায়িত্ববোধ শিক্ষা দিয়েছেন, পরম আত্মা ঈশ্বরকে উপলব্ধি করতে শিখিয়েছেন, জ্ঞান অর্জনে প্রেরণা জাগিয়েছেন। এই পণ্ডিত ব্যক্তি নাম্বার বেশি পাওয়ার জন্য বা ক্লাশে প্রথম বানানোর জন্য কোন চেষ্টা করেছিলেন কিনা তা কোন মহামানব তাদের জীবনীতে উল্লেখ করেননি। তবে মহামানবদের গুরু সারা জীবন তাদের সাথে থাকেননি কিন্তু গুরুর বপন করে যাওয়া প্রেরণা সারা জীবন তাদের চালিত করেছে জ্ঞানার্জনের পথে, নতুনকে জানার ও শেখার পথে। গুরুর দেয়া মূল্যবোধ দৃঢ়তর হয়েছে তাদের কর্মজীবনে, গুরুর দেয়া ধর্মানুভূতি বলিষ্ঠ করেছে তাদের আধ্যাত্মিক জীবন। এ যুগে আমাদের সন্তানদের অনুপ্রাণিত করার জন্য কোন পণ্ডিতব্যক্তির সাহচর্য পাওয়া সম্ভব নয় কিন্তু আমাদের পরিবারগুলোতে নিয়মিতই শিক্ষক আসেন। তারা আমাদের শিশু-কিশোরদের পড়ান, সেটুকুই পড়ান যেটুকু আমাদের সন্তানদের বেশি নাম্বার পেতে সাহায্য করবে। বেশি নম্বর, ভাল রেজাল্ট একজন মানুষকে যতটা সফল করতে পারে বা উঁচুতে নিতে পারে তারচেয়ে অনেক উঁচুতে নিতে পারে তাকে যে একবার তার বুকে শেখার, জানার, জ্ঞার্নাজনের ও দায়িত্ব পালনের প্রেরণা পেয়েছে। সে প্রতিনিয়ত নতুন-নতুন জ্ঞানে সমৃদ্ধ হয়ে সমাজকে, জাতিকে আলোকিত করে।

YCS এর মধ্য দিয়ে কি আমরা আমাদের কিশোর কিশোরীদের হৃদয়ে বপন করতে পারি ধর্মচর্চা, দায়িত্ববোধ ও মূল্যবোধের বীজ? আমরা কি জাগাতে পারি জ্ঞানার্জনের প্রেরণা যা পরবর্তী জীবনে তাদেরকে বিশুদ্ধ, দায়িত্ববান ও আলোকিত মানুষ হতে চালিত করবে? ভাল রেজাল্ট নিয়ে বড় চাকুরী করা আত্মকেন্দ্রিক মানুষ আমাদের কাম্য নয়, আমরা চাই সমাজের প্রতি দায়িত্ববান দয়ালু হৃদয়। YCS এনিমেটরদের প্রশিক্ষণে বিষয়গুলো নিয়ে ভাবার সুযোগ আছে। সেল মিটিংগুলোতে কি নিয়ে আলাপ হবে তার জন্য সুন্দর বিষয় নির্বাচন ও ভাল প্রস্তুতি থাকা প্রয়োজন। সাপ্তাহিক প্রতিবেশীর বিভিন্ন রিপোর্ট থেকে অনুমান করি বাংলাদেশের অনেক ছাত্র-ছাত্রী YCS আন্দোলনের সাথে যুক্ত আছেন এবং ভবিষ্যতে এ সংখ্যা আরো বাড়বে। বিশ্বাস করি YCS থেকে যে প্রেরণা তারা লাভ করবেন সারাজীবন তা র্চচায় রাখবেন, কারণ শুভ কাজের প্রেরণা একবার যে লাভ করে সে সবসময় ভালকাজে নিজেকে জড়িত রাখার চেষ্টা করে অন্যথায় সে শান্তি পায় না॥

"ঈশ্বরের গৃহ বনাম দস্যু গণের গহ্বর

তুষার ফিলিপ দাস

২৫ ডিসেম্বর খ্রিস্ট যিশুর জন্মদিন
দিনটিকে শুধুমাত্র ২৪ ঘন্টায় বেধে ফেলো না
এটাকে তোমার প্রত্যেকটি দিন করে তোল,
২৬ ডিসেম্বর এলে ভুলে যেও না
শুধুমাত্র ২৫ ডিসেম্বরকেই
খ্রিস্টের জন্মদিন বলো না।
খ্রিস্টকে নিজের মাঝে জন্ম না দিয়ে,
শুধুমাত্র 'স্মরণের দিন' হিসেবের একটি
দিনে ছোট করে ফেলোনা
খ্রিস্টকে বরণ-লালন পালন ও অন্যের মাঝে
জন্ম না দিয়ে,
মানুষের মুক্তিতে ধ্বংস হতে দিও না।
খ্রিস্টকে ধারণ না করে কথিত খ্রিস্টান হইয়ো না,
খ্রিস্টধর্মকে 'জীবনাচরণ' না ভেবে
পরিচয় পত্র ভোবো না।
মণ্ডলীর সম্পদকে ন্যায়তা ও শান্তির কাজে
'সর্বমঙ্গল সম্পদ না ভেবে,
ব্যক্তিস্বার্থের সম্পদ ভেবে তছরুফ করে
'মণ্ডলীকে' নরক করে তুলো না।
মনে রেখো একটি কথা,
জীবনাচরণে খ্রিস্ট না থাকলে সে কখনো
খ্রিস্টান হয় না।
ধর্মালয়ে যতই যাও, যতই চাও ব্যক্তি
স্বার্থের আশীর্বাদ বর,
তোমার জীবনাচরণ কইবে কথা যে
কে তোমার ঈশ্বর?
সাধু না হয়ে, সাধু সাজলে মণ্ডলী হয়ে উঠবে
দস্যুগণের গহ্বর।
২৫ ডিসেম্বর হয়ে উঠুক
খ্রিস্টের জন্মের ২৫ ডিসেম্বর॥

ছেলেবেলা আমার নাট্যচর্চার চারণভূমি

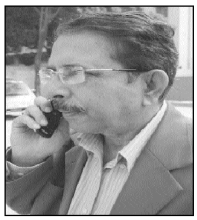

জর্জ ডি'রোজারিও

ছেলেবেলা-ছেলেখেলা শব্দ দুটি অনেক সময় পরস্পর বিরোধিতার সমতা নিয়ে দাঁড়ায়। কিন্ত শব্দ দুটি এমন একটা আবেশ আনে এর ব্যবহারের বিভিন্নতায় যে দুটাকে তখন আর ভিন্নমুখি বলা যায় না। ছেলেবেলা কথাটা মনে এলেই কেমন যেন মনটা বাঁধা মানে না সেই অবাধ সময়টার কাছে চলে যেতে। ছেলেবেলা শব্দটা শুনলেই সবাই ছেলেবেলার ছোট মানুষটি হয়ে যায়। আমারও তেমনটি হয়ে যায়। এই সময় সবাই জিজ্ঞেস করে-তুমি বড় হয়ে কি হবে ? অনেকেই বলে বসে আমি ডাক্তার হব। নয়তো বলে- ইঞ্জিনিয়ার হব। সবাই ভাবে এই ছেলেবেলাটা হল মানুষ গড়ার প্রকৃষ্ট সময়- তাই এই ছোট মানুষগুলোকে এই প্রশ্ন করে থাকে। আমাকে এ ধরণের প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয়েছে। চুপ থেকেছি। কিছু বলতে পারিনি। আর ছেলেখেলাটা মানুষকে নিয়ে যায় এক ভারসাম্যহীনতার অবস্থার দিকে। সে তখন হয়ে উঠে সবার কাছে তামাশার পাত্র। তার চেতনা তখন দেয় তাকে ধিক্কার আর আনে বিড়ম্বনা জীবনে। তবুও এই ছেলেখেলাটা প্রতিটি মানুষের কাছে প্রিয় এক খেলা যা জীবনের কোন না কোন অবস্থায় তাকে প্রলোভিত করে থাকে।

আসলে, আমার জীবনের সমস্ত আশা-নিরাশার সময়টা কেটেছে আমার দাদা দিদিমার বাড়ি, মামা বাড়ি, মামার দেশ শুলপুর, আমার জন্মভূমি। আমার বাবার দেশ ভাওয়াল অঞ্চলের দড়িপারা গ্রামে-সেই সুবাদে আমার দেশ ভাওয়াল আর দড়িপাড়া আমার গ্রাম। কিন্ত জন্মের পর থেকে আমি মামার

দেশেই থেকেছি বেশি সময়। এই শুলপুর গ্রামে আমার পাঠশালা শুরু। শীতের সকালে ঠুকঠুকিয়ে খালি পায়ে পাঠশালায় গিয়ে লাইনে দাড়িয়ে দুইয়ের ঘরের নামতা দুই এক্কে দুই-দু-গুনে চার পড়তে-পড়তে ক্লাসে ঢুকতাম। পথে কুড়িয়ে পাওয়া সেই মান্দার ফুল দিয়ে শ্ল্যাট ঘষে পরিষ্কার করা। সময়টা-সে সময়ের বন্ধুদের ভুলা যায় না। ওরা আসে পাশে থাকে বিচরণ করে স্মৃতির পাতায়। এটাই ছেলেবেলা, এটাই ছেলেখেলা।

এমনি করেই একদিন বাবার হাত ধরে শহরের নতুন স্কুলে ভর্তি হবার জন্য ঢাকায় চলে এলাম। নতুন স্কুল নতুন বন্ধু-বান্ধব। কিন্তু আমি কেন জানি খাপ খাইয়ে নিতে পারছিলাম না। ওদের কথাবার্তা চালচলন কেমন যেন অচেনা লাগতো। তাই যখনই ছুটির সুযোগ পেতাম তখনই ছুটতাম মামা বাড়ি শুলপুর। মামাবাড়ি শুলপুর গ্রাম ঢাকার অদূরে বিক্রমপুর অঞ্চলের এক বর্ধিষ্ণু গ্রাম। এই গ্রামে ছুটে চলে আসার আরেকটা কারণ এখানে প্রতি ছুটিতে কোন না কোন অনুষ্ঠানে নাটক নয়তো যাত্রাপালার আয়োজন হয়ে থাকে। সেই অনুষ্ঠান দেখার লোভ সামলানো এক কঠিন ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছিল। বড়দিন, ইস্টার বা পূঁজার ছুটিতে অবশ্যই কোন নাটক মঞ্চস্থ হয়ে থাকবেই। আমার বিশেষত বড়দিনের নাটকের দিকে নজর থাকতো। নাটকের প্রথম দিন থেকে অর্থাৎ প্রথম রিহার্সাল থেকে নাটকের খোঁজ-খবর না নিলে যেন আর প্রাণ ভরে না। গ্রামের নাটক দলের সদস্য গ্রামের যুবকদল সবাই আমার মামা।

এ ব্যাপারটা একটু অস্বাভাবিক হলেও যেহেতু, আমার মা এগ্রামের মেয়ে তাই এ গ্রামের ছেলেরা সবাই মা'র ভাই। সে হিসাবে তারা সবাই আমাদের মামা। আর ভাগ্নে হিসাবে মামাদের কাছে আমার একটা আলাদা আবদার থাকত নাটকের রিহার্সাল দেখার। মাঝে-মাঝে আমার বন্ধুদেরও সুযোগ হয়ে যেত আমার সঙ্গী হবার। আমরা সবাই মনোযোগ দিয়ে ওদের দেখতাম। প্রতিটি সংলাপ মনদিয়ে শুনতাম। সংলাপ বলার সময় চরিত্র কিভাবে দাঁড়ায়-কিভাবে তাদের প্রতিক্রিয়া প্রদর্শন করে তা লক্ষ্য করতাম। পরে আমরা সাবাই মিলে সেসব সংলাপ নিজেদের মধ্যে আওড়াতে থাকতাম। এমনও অবস্থা হয়েছে যে অবশেষে সংলাপের জগাখিচুড়ী হয়ে অর্থই বদলে গেছে। দেখা গেল নাটকের যে, অর্থে সংলাপ ব্যবহার করছে তা আর রইল না। হয়ে গেল আমাদের ভিন্নধারার 'পালা' নাটকের সংলাপের মত। তাতে কোন আপত্তি নেই আমাদের খেলা চললেই হল।

নাটকের রিহার্সাল থেকে মঞ্চ পর্যন্ত আমরা থাকতাম কারণ মঞ্চের সামনে যে পর্দা থাকে যাকে ড্রপ সিন বলা হয়, সেটার দায়-দায়িত্ব যেন আমরা পাই। এই ড্রপ সিন দুইদিকে দড়ি দিয়ে ঝুলানো থাকত যেটা দৃশ্যের শুরুতে যখন পরিচালক বাঁশী বাজিয়ে সংকেত দিত তখন ঐ রশি টেনে মঞ্চের দৃশ্য দর্শকদের দেখার সুযোগ করে দেয়া ও দৃশ্য শেষে রশি টেনে বন্ধ করার কাজটা বেশ রোমাঞ্চকর ব্যাপার। সেই কাজটা আমাদের ভাগ্যে কখনও জোটেনি। সবসময় ঐ আমাদের চেয়ে একটু বড়দের হাতে চলে যেত।

জোটেনি বলে কি আর আমরা বসে থাকতে পারি? আমরা ঠিক করলাম, আমরাও নাটক মঞ্চস্থ করবো। শুরু হয়ে গেল নাটকের প্রস্তুতি। কিন্ত কোথায় মঞ্চ বানাবো? অবশেষে পাওয়া গেল এক জায়গা। আমার মামাবাড়ির কাছেই এক বাড়ি, এটাও আমার মামাবাড়ি। বাড়িটা সবার পছন্দের কারণ এবাড়িতে অনেক লম্বা এক চালাঘর। তার সমপরিমাণ এক বারান্দা। বারান্দার এক কোণায় মঞ্চ বানালে সামনের খোলা জায়গাটা দর্শকের জন্য থাকবে।

সে বাড়ির বড় বউ জয়ন্তীর মা সবার চেনা- আমাদের সকলের প্রিয় মানুষ। তাকে রাজি করাতে আমাদের কোন অসুবিধা হল না। আমরা লেগেগেলাম কাজে- সবাই নিজ নিজ বাড়ি থেকে মা বোনদের শাড়ি, বিছানার চাদর নিয়ে এল মঞ্চ বানানোর জন্য। অবশ্য এর মধ্যেই গ্রামভরে প্রচার শুরু করে দিয়েছে আমাদের অনুরাগী সদস্যরা। এখন শুধু বিকালের অপেক্ষা। দুপুর গড়িয়ে বিকেল হবে-হবে ভাব- দেখলাম, গ্রামের বউ-ঝিরা বাচ্চা-কাচ্চাসহ ছুটে আসছে। আর দ্বিধা রইল না- আমরা কাজের কাজ করে ফেলেছি। আমাদের কি কাজ দেখে যে, তারা এত উল্লসিত হল তা আমরা বুঝতে পারিনি। অনেক পরে বুঝেছি আমাদের আবোল-তাবাল সংলাপ বলার কারণে দর্শক এত আনন্দ পেয়েছিল। ভীষণ মন খারাপ- জীবনের প্রথম নাটক- সেটার এ করুণ অবস্থা !

জানি না কিভাবে আমাদের এই নাটকের কথা আমাদের বয়োজ্যেষ্ঠদের কানে পৌঁছে গেল। একদিন নিধন দা আমাদের আড্ডায় এসে হাজির। আমরা তো ভয়ে কাঠ। কি জানি কি করে বসে। কিন্তু না, কিছুই বললেন না, শুধু বললেন 'যা কর ভালমতো কর। মন দিয়ে কর'। আমার দিকে তাকিয়ে বললেন- 'তুমি তো ঢাকায় পড়াশুনা কর। ঢাকায় দেখা কর'। সেই হলো শুরু-ঢাকায় আসার কিছুদিন ভয়ে দেখা করিনি। যখন দেখা করলাম, তখন তিনি 'প্রতিবেশী' বড়দিন সংখ্যা নিয়ে ব্যস্ত- আমাকে সোজা বলে ফেললেন- প্রতিবেশীর জন্য কিছু একটা লিখ।' আমি তো অবাক আমি আবার কি লিখব। যাক শেষপর্যন্ত একটা লেখা লিখেই ফেললাম। ছাপা হল বড়দিন সংখ্যা

'প্রতিবেশী' তে। আরে যা এ আবার কি বলছি বলতে এলাম নাটকের কথা আর কিসসা কাহিনী- বলছি লেখালেখির। যাই হোক, স্কুলে ভর্তি হওয়ার পর দেখলাম- আমার মত কিছু নাটকপাগল ছাত্র আছে। তাদের দলে ভীড়ে গেলাম তৈরি হয়ে গেল "কিশলয় সংঘ" নামে ছাত্র সাংস্কৃতিক সংস্থা। আমরা তখন ক্লাস এইট পাশ করে নাইন- উঠেছি। একটা পাগলামি করে ফেললাম। নাটক মঞ্চস্থ করলাম- ব্রিটিশ কাউন্সিল হলে। সেই "কিশলয় সংঘের" উদ্যোগে। নাটকের নাম মনে পড়ছে না তবে নাটক নির্বাচনে যে কি বিড়ম্বনা হয়েছিল তা মনে আছে। নাটকে নারী চরিত্র করার মত নারী শিল্পী পাওয়া ছিল দুষ্কর ব্যাপার। তাই স্কুল কলেজের নাটক হতে হবে নারী চরিত্র বর্জিত। সে ক্ষেত্রে নিজেদের মত করে নাটক লিখতে হবে নয়ত কোন লেখকে দিয়ে নারী চরিত্র বর্জিত নাটক লিখিয়ে নিতে হবে। এই করেই চলছিল নাটক মঞ্চায়ন। আর সেটা হোক শহরে বা গ্রামে।

কলেজের পড়াশুনা শেষ করে যখন শিক্ষকতা শুরু করলাম তখন মাথাচাড়া দিয়ে উঠল নাটকের নেশাটা। অজয়দা এগিয়ে এলেন, তিনি লিখে ফেললেন নাটক "বিবর্তন"। মঞ্চস্থ হল নাটক স্কুল হলঘরে। অবশ্যই নারী বর্জিত নাটক। এরপর প্রধান শিক্ষক ব্রাদার রবার্টকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে রাজী করালাম রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের "ডাকঘর" নাটক মঞ্চস্থ করার।

কিশোরী আগ্নেস গোমেজ'কে দিয়ে সুধার চরিত্র অভিনয় করালাম। এরপর আমি আরও চারবার "ডাকঘর" মঞ্চস্থ করেছি। ২বার সেন্ট গ্রেগরী স্কুলের ছাত্রদের নিয়ে করা। সুহৃদ সংঘ হ'বার পরে ঢাকায় একবার আর একবার সহৃদ সাংস্কৃতিক দলের সাথে গিয়ে সুহৃদ নাট্যদলের হয়ে চট্টগ্রাম সেন্ট প্লাসিডস্ স্কুল মিলনায়তনে। সুধা চরিত্রের জন্য কোন আসুবিধা হয়নি। আমার ছোট বোন রিনা দু'দুবার সুধা চরিত্র অভিনয় করেছে। বিভিন্ন সময়ে মঞ্চস্থ 'ডাকঘর' নাটকের সবকটি প্রদর্শনীর সেট ডিজাইনার ছিল শেখ মনসুরউদ্দীন আহম্মেদ। নাগরিক নাট্য সম্প্রদায়?' এর প্রায় সবকটি নাটকের সেট ডিজাইনার ও শিল্প নির্দেশক প্রথিতযশা শেখ মনসুরউদ্দীন আহম্মেদ। প্রথম যখন ডাকঘর নাটকটি করি, তখন স্কুলের আর্ট ক্লাসের তুখোড় ছেলে মনসুরকে দায়িত্ব দেই সেট পরিকল্পনা ও ডিজাইনের। সেই থেকে যে সকল নাটকে আমি পরিচালনায় ছিলাম সবকটি নাটকেই মনসুর ছিল। চারুকলা ইনিসটিটিউটে পড়াকালীন সময়ে বা পাশ করার পরেও, এমনকি মনসুরের নাগরিক নাট্য সম্প্রদায়ে ব্যস্ততার মাঝেও যখনই ডেকেছি তখনি পেয়েছি তাকে।

আমার প্রিয় ছাত্র মনসুর। গুরুভক্তির এক প্রকৃষ্ট উদাহারণ ছিল মনসুর। গুরুভক্ত মনসুরকে কয়েক যুগ ধরে দেখেছি, কোনদিন দেখিনি মনসুর তার স্যারের কাজে না বলতে।

ঢাকায় আমাদের আদি বাস কুলুটোলার এক ভাড়া বাসায়। সেখানেই আমাদের বেড়ে উঠা। ছোটবেলায় খেলার সাথীদের নিয়ে খেলার ক্লাব-'সান রাইজ বয়েজ ক্লাব' ও পরবর্তীতে, ষাটের দশকের মাঝামাঝি সাংস্কৃতিক সংস্থা "আনন্দিক" গঠন এবং এখান থেকেই নাটক মঞ্চায়ন শুরু। আমরা কল্যাণ মিত্রের নাটক 'প্রদীপ শিখা' 'কুয়াশা কান্না' ও খান জয়নুলের 'ঘর মন জানালা' মঞ্চস্থ করি। নাট্যব্যক্তিত্ব আলী মনসুর, আলী কাওসার, এজাজ খান, নারায়ণ ঘোষ ওরফে মিতা (পরবর্তীতে সিনেমা পরিচালক) ছিলেন আমাদের নাটকের পরিচালক। "আনন্দিক" প্রতিষ্ঠিত হবার আগে আমরা রবীন্দ্রনাথের 'ডাকঘর' নাটকটি মঞ্চস্থ করি মণ্ডপে। স্থানীয় এক পুরাতন মন্দিরে- নাটকে বাইরের কোন দৃশ্য বা নাটকের সিন ব্যবহার না করে মন্দিরের পরিবেশটাকে ব্যবহার করে এক 'রাবীন্দ্রিক' আঙ্গিক নিয়ে আসা হয়েছিল। অভিনয় ও পরিচালনার ভার আমাকেই নিতে হয়েছিল।

তখন মহিলা সমিতিকে কেন্দ্র করে কোন group থিয়েটার নাট্যচর্চা গড়ে ওঠেনি। সমস্ত নাট্যচর্চার কেন্দ্রবিন্দু ছিল রমনার ইঞ্জিয়ারস্ ইনস্টিটিউট। আমাদের আনন্দিকের সব নাটক রমনার ইঞ্জিনিয়ারস্ ইনস্টিটিউট হলে অর্থের বিনিময়ে মঞ্চস্থ করতে হত। শুধু তাই নয় সময়টা তখনও এমন হয়নি যে নাটকে নারী চরিত্র অভিনয় করার জন্য শিক্ষিত সৌখিন নারীরা এগিয়ে আসবেন। নারী চরিত্র অভিনয় করার জন্য নাটকের বা সিনেমার মেয়েদেরকে পারিশ্রমিকের বিনিময়ে অভিনয় করাতে হত। আমাদেরকে এই অর্থ যোগান দিতে হত সম্পূর্ণভাবে শুভাকাঙ্ক্ষীদের দানের ওপর নির্ভর করে। ইতোমধ্যে, ১৯৬৯ খ্রিস্টাব্দে ঢাকার খ্রীষ্টান যুব প্রতিষ্ঠান "সুহৃদ সংঘ" প্রতিষ্ঠিত হল। "সুহৃদ সংঘ" নাটক প্রযোজনা করতে থাকল। আমাদের আর নারী চরিত্র নিয়ে কোন চিন্তা রইল না কারণ সংঘের মেয়ে সদস্যরা রাজি হয়ে গেলেন আমাদের সাথে অভিনয় করতে। সুহৃদ প্রযোজনা হিসেবে মঞ্চস্থ হলো বিধায়ক ভট্টাচার্যের 'ক্ষুধা', আলী মনসুরের 'পোড়ো বাড়ী' ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'ডাকঘর'। সুহৃদ সংঘ খ্রীষ্টান সম্প্রদায়ের সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড বিশেষ করে নাট্যধারায় সনাতনী ধারার বদলে আকৃষ্ট হলে বেইলী সডকস্থ মহিলা সমিতি মিলনায়তনে গড়ে উঠা নবনাট্য ধারায়। আমার সাথে কয়েকজন নাট্যমোদী একত্রিত হয়ে নাগরিক নাট্যদল, থিয়েটার, ঢাকা থিয়েটারের প্রথম দিককার নিয়মিত দর্শক। শুরু হল নিজস্ব প্রয়োজনে নাটক লেখার। প্রথমে নিজেই নাট্যরূপ দিয়ে বসলাম জহীর রায়হানের 'লেট দেয়ার বি লাইট'। সুহৃদ প্রযোজনা ও আমার পরিচালনায় মঞ্চে নিয়ে আসলাম আমার নাট্যরূপ দে'য়া নাটকটি। এরপর গিয়ে ধরলাম নিধনদাকে। একদিন আমাকে বললেন- 'তোমরা তো আমার নাটকের সংলাপ ভুলভাবে বলে গল্পের বারোটা বাজিয়েছিলে। এবার তোমাদের সংলাপ নিয়ে আমরা নাটক লিখবো'। এবার বুঝলাম নিধন দার নাটক "আশির্বাদ" যেটা গ্রামে মঞ্চস্থ হয়েছিল, আর সেটা আমরা যখন জয়ন্তীর মার বাড়িতে খেলার ছলে মঞ্চস্থ করেছিলাম, সেই নাটকের কথাই বলছেন। আদেশ জারি হয়ে গেল- 'তোমরা দুজন করে প্রতিদিন সন্ধ্যায় আমার বাসায় আসবে। তারপর আমরা নাটক লিখব'। প্রতিদিন আমি আর চন্দন হাজির হতাম নিধনদার বাসায়। তিনি আমাদেরকে একটা দৃশ্য বুঝাতেন, তারপর বলতেন 'তোমরা চরিত্র অনুযায়ী কথাবার্তা বলে যাও'। মাঝে-মাঝে আমাদেরকে শুধরে দিতেন যাতে

আবার গল্পকে ছাড়িয়ে না যাই। এভাবেই তিনি আমাদেরকে দিয়ে সংলাপ বানিয়ে লিখে নিতেন। নাটক লিখে ফেললেন নব-নাট্যধারার নাটক "সাম্প্রতিকের মহড়া"। সুহৃদ প্রযোজনায় মঞ্চস্থ হল আমার পরিচলনায় সেন্ট গ্রেগরিজ স্কুলের হলে। দর্শক নাটকের প্রশংসায় পঞ্চমুখ।

আমি জহীর রায়হানের 'লেট দেয়ার বি লাইট' এর নাট্যরূপ দেই এবং সুহৃদ সংঘের প্রয়োজন লিখে ফেলি নাটক স্বর্গপুরীতে মান-ুষ' ও বাণীদীপ্তি'র পোপ দিবস উপলক্ষ্যে নাটক 'পথ আমার পথ'। সুহৃদ পরিমন্ডলে এসে আমি অভিনেতার পাশাপাশি হয়ে গেলাম নাট্যকার ও নাট্য নির্দেশক। স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশে মহিলা সমিতি মিলনায়তন কেন্দ্রীক নবনাট্যধারা আন্দোলনের শুরু হলে খ্রীষ্টান সম্প্রদায়ে তা শুরু করে সুহৃদ সংঘ। ১৯৭২ থেকে পর্যায়ক্রমে খ্রীষ্টান যুব সংগঠন সুহৃদ সংঘ আয়োজিত নাটকসমূহ 'লেট দেয়ার বি লাইট', 'স্বর্গরুরীতে মানুষ', 'স্ফিংস', সুবচন নির্বাসনে' প্রভৃতি নাটকের পরিচালক ছিলাম আমি। ১৯৭২ সনেই 'সুহৃদ সাংস্কৃতিক দল' চট্টগ্রাম সেন্ট প্লাসিড স্কুল মিলনায?তনে পরিবেশনা করে গীতি-নক্সা ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'ডাকঘর' নাটক আমার পরিচালনায়। ১৯৭৪ খ্রিস্টাব্দে সুহৃদ সংঘের নাট্যদল নিয়ে বিদ্যুতবিহীন গোল্লা গ্রামে 'কলরেডী'র জেনারেটের ব্যবস্থাপনায় নবনাট্যধারায় সুহৃদ সংঘ আমার পরিচালনায় মনচস্থ করে আব্দুল্লাহ আল মামুন রচিত নাটক 'সুবচন নির্বাসনে'। সুহৃদ সংঘ প্রযোজিত নাটক "সুবচন নির্বাসনে"র ছবি।

ষাটের দশকের শেষের দিকে ঢাকাস্থ ব্রিটিশ কাউন্সিলের আমন্ত্রণে আগত ব্রিটিশ নাট্যকারের সাথে সেন্ট গ্রেগরী স্কুলের

ছাত্রদের নিয়ে সহকারী পরিচালক হিসেবে ইংরেজীতে 'ম্যাকবেথ' ঢাকার লালকুঠি মঞ্চে মঞ্চায়ন করেছিলাম। পরবর্তীতে 'ম্যাকবেথ' নাটকটি তৎকালীন একমাত্র টেলিভিশন BTV তে প্রচারিত হয়েছিল।

সুহৃদ সংঘের একটি পরিকল্পনা ছিল যীশু খ্রিস্টের জীবনী নিয়ে একটি নৃত্যনাট্য মঞ্চায়নের। সেটাকে সামনে রেখে প্রায় একই বয়সী ২০ জন ছেলে-মেয়েকে গওহর জামিল-রওশন জামিল পরিচালিত নাচের স্কুলে নাচ শিক্ষার জন্য ভর্তি করা হয়। নিধনদার দ্বারস্থ হয়ে অনুরোধ জানালে নিধন ডি: রোজারিও রচনা করেন গীতি-নৃত্য-নাট্য "মৃত্যুঞ্জয়ী যীশু"। ১৯৭৭ খ্রিস্টাব্দে তৎকালীন আর্চবিশপ গাঙ্গুলী সিএসসি'র হঠাৎ তিরোধানে নতুন আর্চবিশপ মাইকেল রোজারিও'র অভিষেক অনুষ্ঠানে বাণীদীপ্তি *'মৃত্যুঞ্জয়ী যীশু'* মঞ্চস্থ করার ইচ্ছা প্রকাশ করলে সুহৃদ সংঘের অনাপত্তিতে নিধন ডি'রোজারিও নৃত্য-নাট্যটি নাটকে রূপান্তর করেন। আর্চবিশপ মাইকেল রোজারিও'র অভিষেকানুষ্ঠানে কার্ডিনাল আর্চবিশপ প্যাট্রিক ডি'রোজারিও অভিনীত ও নিধন ডি: রোজারিও রচিত *"মৃত্যুঞ্জয়ী যীশু" (যীশু চরিত্রে বর্তমান কার্ডিনাল আর্চবিশপ প্যাট্রিক ডি'রোজারিও সিএসসি অভিনীত)* নাটকে হেবল ডি'ক্রুশের সাথে সহ-পরিচালক ছিলাম।

এরই মধ্যে নিধনদা লিখলেন তাঁর অমর গীতিনাট্য "একুশের আত্মারা কাঁদে"। মঞ্চস্থ করলাম সেন্ট গ্রেগরীস্ স্কুলের মাঠে একুশে ফেব্রুয়ারি সন্ধ্যায়।

আমার ছেলেবেলা যে শুধু শুলপুর কেটেছে তা নয়। আমার কৈশোরে অনেকটা সময় কেটেছে দড়িপাড়া আমাদের নিজ গ্রামে। সেখানে আমার প্রধান আর্কষণ কাকা ফ্লেবিয়ান রোজারিও (ফেলা কাকা)।

উনার সাংসারিক কাজের চেয়ে গান-বাজনার দিকে ঝোঁক বেশি। তিনি আমার নাটক করার পক্ষে অনেক কথা বলেন। পরে তিনি নিজেও গ্রামের নাটকের দলে মনোযোগী হয়ে গেলেন। তাকে দেখেছি 'আগ্নেশের পালা'য় অভিনয় করতে। এই কাকার কাছ থেকে অনেক উৎসাহ উপদেশ পেয়েছি। 'ঠাকুরের গীত' নামে সাধু আন্তনীর জীবনভিত্তিক পালাগানকে স্থানীয় ভাষায় 'ঠাহুরের গীত' বলেই চিনতো। সেই গানের দলের একনিষ্ঠ সদস্য ছিলেন তিনি।

পৌরাণিক গল্পের শেষ টানার মতো বলা যেত-"আমার কথা ফুরালো নটে গাছটি মুড়ালো আমার গল্পটি শেষ হল। "কিন্তু সেভাবে তো শেষ করা যাবে না। কেন আমাকে আমার ছেলেবেলায় চলে যেতে হল তা না বললে তো আর লেখার উদ্দেশ্যই রইল না।

শিক্ষকতা জীবনে যখন স্কুলের ছাত্রদের নিয়ে নাট্যচর্চা করতে শুরু করলাম- সে সময় আমারই মত এক নাটকপাগল ছাত্র পেয়ে গেলাম। সে আমার সব নাটকের সেটের ডিজাইন করে দিত। কারণ ওর আবার ছবি আকার ঝোঁক ছিল প্রবল। আমার ছাত্র মনসুরের কথা বলছি। পরবর্তীতে ও ঢাকার নাট্য আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণ করে এবং বিশেষ খ্যাতি অর্জন করে । সে মাঝে-সাঝে তার সব কৃতকর্মের জন্য বিশেষভাবে দায়ী করে তার সেই স্কুল জীবনের শিক্ষককে। অর্থাৎ আমাকে। ও ছাড়া আরেক ছাত্রকে পেয়েছিলাম যে, আমার কিছু নাটকের অসাধারণ সব সেট তৈরি করেছিল সে হল আসেম আনসারি।

প্রয়াত আসেম আনসারি আসেম আমার নাটক "লেট দেয়ার বি লাইট" এর অসাধারণ মঞ্চ সাজিয়ে ছিল। মনসুরের এখন প্রশ্ন স্যার আপনি কিভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন এসব কর্মে যখন নাটকের চর্চায় এত বাঁধা এতসব অনুশাসন ছিল। আর সেই প্রশ্নের প্রেক্ষিতে আমাকে চলে যেতে হল আমার বাল্যকালে আমার 'ছেলেবেলায়'। ছেলেখেলার সেই ছেলেবেলা যে, আমার জীবনে কতটুকু মাহাত্ম্য রেখে ছিল তা এখন বুঝা যায়।

ছেলেবেলায় যাবার প্রাক্কালে আমার আরও একটা বিষয়ে খেয়াল পড়ল। সেটা আমার শ্রদ্ধেয় পিতা। তিনিও সেন্ট গ্রেগরিজ হাই স্কুলের সিনিয়র শিক্ষক ছিলেন। সারাজীবন তিনি শিক্ষকতা করে গেছেন- তাঁর জীবনে সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের সাথে কোন যোগ আমরা কোনভাবে চিন্তাই করিনি। কিন্তু তিনি আমাদের সবকাজে উৎসাহ দিতেন। তবে মাঝে-মাঝে তিনি গুনগুনিয়ে একটি গান গাইতেন। তিনি গান গাওয়ার মত করে গান গাইতেন না, তবে কাজের মাঝে গুনগুন করে গেয়ে চলেছেন এমন ভাব অনেকবার দেখেছি। বুঝতে পারতাম গানটি তার খুব প্রিয়।

"খরবায়ু বয় বেগে, চারিদিক ছায় মেঘে,
ওগো নেয়ে, নাওখানি বাইয়ো।
তুমি কষে ধরো হাল,
আমি তুলে বাঁধি পাল--
হাঁই মারো, মারো টান হাঁইয়ো?"

এ গানের সাথে যে, তার জীবনের ভীষণ মিল ছিল তা এখন আমরা বুঝতে পারি। এই গানের মর্মার্থ থেকেই তিনি অনুপ্রেরণা নিয়ে আমাদের বড় একটি পরিবারের ভারী পাল শক্ত হাতে ধরতে পেরেছিলেন সঙ্গে ছিল আমাদের সদা হাস্যময়ী মা।

আজ আমরা যে যখানেই যে অবস্থায় আছি সেটা শুধু আমাদের শ্রদ্ধেয় পিতাশ্রী স্বর্গীয় জুলিয়ান স্যারের প্রেরণা ও উৎসাহের ফল। আজও আমরা সেই গানের কথায় "হাঁই মারো, মারো টান হাইয়ো?" -বলেই এগিয়ে যাচ্ছি॥ ৯

অনুনয়

তন্ময় বেনেডিক্ট কোড়াইয়া

ধরায় নান্দনিক যা কিছু আছে
তা বিধাতা তোমারই সৃজন,
তুমি বিশ্বের অধিকর্তা,
তোমায় করি পূজন?
রজনীতে তোমার আশিসে
করি নির্বিঘ্নে কালক্ষেপণ,
তোমাতে ভরসা রেখে
নিত্য আমার শয়ন?
যত পাহাড় গিরি, জলপ্রপাত,
যত অতল-গহ্বর, উদ্যান,
যত সাগর-সিন্ধু, আগ্নেয়গিরি,
সমস্ত তোমারই রূপ দান
নিত্য আমায় ভালবেসে
কর নতুন দিবস দান,
বিধাতা তুমি, সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী
তুমি সর্বশক্তিমান?
বিধাতা,
তুমি দান কর দৃঢ় মনোবল,
বিপদে তোমাতে ভরসা রেখে
যেন থাকি অবিচল?

কৃপাপ্রার্থী

উইলিয়াম রনি গমেজ

এই স্থবিরতা, এই নিষ্ঠুর স্তব্ধতা
কামনা করিনি কখনো
পৃথিবী আজ থমকে গেছে
অতি ক্ষুদ্র অনুজীবের কাছে
মানবজাতি আজ পরাজিত
চতুর্দিকে মানুষের করুণ আর্তনাদ
প্রিয় স্বজনের মৃতদেহ এখানে ওখানে, সর্বত্র।
এ কোন বিভীষিকা; এ কোন অভিশাপ!
প্রিয় যিশু, বড় বেশি অস্থির উৎকণ্ঠা
তোমার আগমনের প্রতীক্ষায় সকলেই ব্যাকুল
তুমি এসো, এ ভয়ার্ত দুর্দিনে
তোমার আলোর বিভায়
দুর করে দাও সমস্ত পাপ-কালিমা ও জঞ্জাল
তোমার শুভ্র জ্যোতির কণায়
উদ্ভাসিত করো আমাদের অন্তর
হৃদয়ে প্রজ্বলিত করো
বড়দিনে নির্মল আনন্দ॥

নতুন পুরাতনে সমন্বয়

মিতালী মারিয়া কস্তা

স্যালুট এই নতুন প্রজন্মকে। এরা বুদ্ধিতে তীক্ষ্ম, দক্ষতায় তীব্র। স্বপ্নপূরণে এরা দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। মাঝে-মাঝে এদের চিন্তা-চেতনাকে মনে হয় আমাদের ধরা ছোঁয়াও বাইরে। কারণ এদের ঝলমলে চোখই বলে দেয় এরা বিশ্বকে নিয়ে যাবে আরোও সুদূরে। তাই এরা পদচারণায় দৃপ্ত, স্বপ্ন-পিয়াসী, কৌতুহলী, আগামীর অগ্রগামী।

আমাদের বর্তমান সরকারের স্বপ্ন বাংলাদেশকে ডিজিটাল বাংলাদেশে পরিণত করা। এই স্বপ্ন পূরণের প্রত্যাশায় সরকার আমাদের বিভিন্ন ডিজিটাল সুযোগ-সুবিধা দিয়ে যাচ্ছে। স্যাটেলাইটের বদৌলতে আমরা ঘরে বসে ভিডিওতে কথা বলতে পারি। পৃথিবীর আরেক প্রান্তে থাকা প্রিয়জনের সাথে, তাৎক্ষণিকভাবে যে কোন সংবাদ আদান-প্রদান করতে পারি, পেয়ে যাই যে কোন আগাম সংবাদ, উপভোগ করতে পারি বিশ্ব সংস্কৃতি ... আরো কত কি! অথচ আজ থেকে কয়েক দশক আগে কেউ বিদেশ গেলে তার পৌছানোর সংবাদ পেতে হলে কম করে হলেও একমাস অপেক্ষা করতে হত। নব্বইয়ের দশকে টর্নেডোতে ক্ষতির পরিমাণ এবং একবিংশ শতাব্দীর সিডরের ক্ষতির পরিমাণ তুলনা করলেই আমরা বুঝতে পারি প্রযুক্তিতে আমরা কতটা এগিয়ে। আধুনিক প্রযুক্তি আমাদের জীবন-যাত্রাকে করেছে সাবলীল। নতুন প্রজন্ম বৃদ্ধি পাচ্ছে প্রখরতা নিয়ে।

এবার আজ থেকে চল্লিশ বছর আগে যারা টিনএজার ছিল চলুন তাদের শৈশব দিনে একটু ঘুরে আসি। কি করত ঐ সময়ের তরুণেরা? কিভাবে কাটত তাদের অবসর? খোলা মাঠে ছুটে বেড়ানো, খেলাধূলা আর প্রচুর বই পড়া ছিল সে সময়ের তরুণ প্রজন্মের আনন্দ-অবসর কাটানোর ও মেধা বিকাশের মাধ্যম। প্রকৃতির সাথে তাদের সম্পর্ক ছিল নিবিড়। সময় কাটত বন্ধুত্বের আবহে। বন্ধুদের সাথে আলোচনা, তর্ক-বিতর্কের মাধ্যমে আহড়িত হত তথ্য, পূর্ণতা পেত জ্ঞানভাণ্ডার। আজকের এই আধুনিকতায় তাদের কি কোন অবদান আছে? বিস্ময়কর এই স্যাটেলাইট যুগকে তো তারাই আমাদের সামনে উন্মোচন করেছে। আর কিভাবে কাটে এ প্রজন্মের অবসর? এখনকার তরুণদের আনন্দ-অবসর কাটে ও মেধা বিকাশ হয় ভার্চুয়াল মাধ্যম ব্যবহারের মধ্যদিয়ে। কম্পিউটার কিংবা মোবাইলের মত ছোট্ট একটা ডিভাইস সাথে থাকলে তাদের একাকিত্ব বিলীন হয়ে যায়। কাটিয়ে দিতে পারে ঘন্টার পর ঘন্টা, সঙ্গীবিহীন। প্রকৃতির সাথে তাদের প্রগাঢ়তা নেই তেমনভাবে। তাই বলে কি এই প্রজন্ম অজানার অন্ধকারে হারিয়ে যাচ্ছে? মোটেও না। তফাৎটা তাহলে কোথায়? এখন জ্ঞান আহরণ হচ্ছে বোতাম টিপে, আগে হত বই পড়ে। এখন তরুণ প্রজন্ম নিজে কিছু আবিস্কার করার চেয়ে সহজেই সংগ্রহ করে ফেলে নেট থেকে। একটা শব্দের অর্থের জন্য কেউ এখন অভিধান ঘাটাঘাটি করে না, একটা বোতাম টিপেই তা বের করে ফেলে। আগের প্রজন্ম বই পড়ে যা জেনেছে, এখনকার প্রজন্ম কয়েক মূহূর্তের মধ্যেই তা জেনে ফেলে প্রফেসর গুগলের সহায়তায়। গুগলের মাধ্যমে প্রজেক্ট তৈরি করতে তাদের লাগে শুধুমাত্র কিছু উপকরণ। যার সাথে গুগল আছে এবং যে জানে কিভাবে গুগল ব্যবহার করতে হয় সে হয়ে যায় জ্ঞানরত্ন। সমস্ত পৃথিবীটাকে যেন হাতের মুঠোয় নিয়ে আসতে চায়। কি বিস্ময়!

সেসময় সারা গ্রামে কিংবা পাড়ায় ছিল একটা মাত্র টেলিভিশন, যার চ্যানেল ছিল মাত্র একটা। সবাই মিলে উপভোগ করত একই অনুষ্ঠান, নিজেদের মধ্যে আলোচনা হত সেই অনুষ্ঠান ঘিরেই। তৈরি হত সম্পৃক্ততা। আর আজ? একটা পরিবারে একাধিক টিভি, শতাধিক চ্যানেলসহ। একই পরিবারের সদস্যরা উপভোগ করছে ভিন্ন ভিন্ন চ্যানেল ভিন্ন-ভিন্ন টিভিতে, ভিন্ন-ভিন্ন ঘরে বসে। তৈরি হচ্ছে দূরত্ব। সে সময়ে এক অথবা দুইদিন নাটক দেখার সুযোগ হত সবার। ছিল সম্পৃক্ততা। আর বাকী দিনগুলোর অলস সময় কাটত কিভাবে? বয়োজ্যেষ্ঠদের অলস সময়ের একটা বড় অংশ কাটত গল্প করে আর ছোটদের কাটত সেই গল্পগুলি শুনে। তৈরি হত একাত্মতা। আমরা তাকিয়ে দেখি তখনকার দাদা-নাতি এবং এখনকার দাদা-নাতিদের সম্পর্ক। আমরা আধুনিক নাতি-নাতনীরা সময় কাটাই কার্টুন দেখে, মোবাইলে গেম খেলে। আর আধুনিক দাদা-দাদীরা সময় কাটাই সিরিয়াল দেখে। ফলে অগ্রজ এবং অনুজদের মধ্যে সম্পর্কের সেতুবন্ধনে দেখা দিচ্ছে নাজুকতা। আগে ছোট-ছোট বাচ্চাদের দল বেঁধে রাস্তায় খেলতে দেখা যেত। আর এখন? মা-বাবারা সন্তানদের বাইরে খেলতে পাঠাতে ভরসা পান না। আগের মত খোলা মাঠ নেই। নেই ভরসা বন্ধুত্বে। তাই বলে কি তাদের মেধা বিকাশ হচ্ছে না? হচ্ছে। আধুনিকতা এদের মাঝে এনে দিয়েছে অনেক বিস্ময়। এরা হচ্ছে একেকটা ক্ষুদে কম্পিউটার।

সবার মধ্যে বাড়ছে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের ব্যবহার। এটা একটা বড় উন্নয়নের লক্ষণ। বিশেষভাবে, অনেক জবুথবু মেয়ে, যারা ঘরের চার দেয়ালের বাইরে কিছুই বুঝত না, বিশ্ব উন্মুক্ত হচ্ছে তাদের কাছে। তারা শিখছে, জানতে পারছে অজানাকে। নিজের অধিকারবোধ, আত্মসম্মান জাগ্রত হচ্ছে। নিজের অজান্তেই হয়ে যাচ্ছে স্মার্ট। সময়ের পরিবর্তনে নিজেরাও হয়ে যাচ্ছে নতুনীকৃত।

বয়োজ্যেষ্ঠদের সময়ও এখন কাটে টিভি কিংবা ইন্টারনেট বিনোদনে। তাদের সময় কাটে আনন্দে। সন্তানেরা ভাবে মা-বাবা ভাল আছে। স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে।

অগ্রজরা ভাবেন বেশ ছিল আগের দিন, অনুজদের কাছে এসময় শ্রেষ্ঠ সময় - আধুনিকতায়, বুদ্ধিমত্তায়, সৃজনশীলতায়। আসলে কি তাই? কেমন হয় যদি দুই সময়ের মধ্যে তৈরী হয় কিছু সমন্বয়, একটু সেতু বন্ধন? সম্পর্কের দৃঢ়তা বাড়ানোর জন্য অগ্রজদেরই এগিয়ে আসতে হবে। তুলে দিতে হবে নতুন প্রজন্মের হাতে প্রাচীন আনন্দ মাধ্যমের স্বাদ, বুঝিয়ে দিতে হবে যে গুগলই সব জানে না। যারা গুগল আবিস্কার করেছে তারা এই জ্ঞান গুগল থেকে বা নেট থেকে নয়, আবিস্কার করেছে তাদের মেধা দিয়ে। সেই মেধা শাণিত হয় চর্চায়। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম সবাইকে স্মার্ট বানাচ্ছে। কিন্তু এই স্মার্টনেস কখনো-কখনো এনে দিচ্ছে বিপর্যস্ততা। অনেকেই নিজের অজান্তেই জড়িয়ে যাচ্ছে নানা রকম অসম সম্পর্কে। সৃষ্টি হচ্ছে সংসারে অশান্তি, বাড়ছে সন্তানদের ভোগান্তি। কোথায় নিয়ে যাচ্ছে এই প্রযুক্তি আমাদের? দোষ কার? প্রযুক্তির নাকি প্রযুক্তি ব্যবহারকারীর? এখানে ভালো-মন্দ দুটোই আছে, বেছে নেয়ার দায়িত্ব ব্যবহারকারীর।

বড়দের মাঝে আক্ষেপ শোনা যায়- আজকাল ছেলে-মেয়েরা আর সম্মান করে না। কার দায়িত্ব তাদের সম্মান শেখানো? বড়দের নয় কি? যুবকরা নেশা করে রাস্তায় মাতলামি করে, পরস্পর ঝগড়া করে। এতে বাড়ছে কোন্দল, দলাদলি, ক্ষয়িত হচ্ছে সম্পর্কের প্রগাঢ়তা। ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে পরবর্তী প্রজন্ম। কোথায় পেয়েছে তারা এই সাহস? কাদের দেখে তারা এইসব শিখেছে? এইজন্য কি অগ্রজরাই দায়ী নন? একজন আদর্শ নেতার একটা বড় কাজ তার পরবর্তী নেতা তৈরী করা। আমাদের মাঝে দৃশ্যমান এই ঘাতটি কিভাবে পূরণ হবে? কে আসবে এগিয়ে?

বুদ্ধিতে ক্ষুরধার এই নতুন প্রজন্মকে সঠিক দিক-নির্দেশনা দিবে অভিজ্ঞ বয়োজেষ্ঠ্যরা। এটা তাদের দায়িত্ব। স্যাটেলাইট যুগ মানে পুরানোকে অবজ্ঞা করা নয়। সাধুবাদ সেই পুরনোদের যারা এই নতুনদের এনে দিয়েছে স্যাটেলাইট যুগ।

জয়তু স্যাটেলাইট, জয়তু নতুন প্রজন্ম।

বন্ধুর পথে নারীর এগিয়ে চলা

অনিতা মার্গারেট রোজারিও

কোনো বাধাই নারীকে আটকাতে পারবে না যদি তার মনোবল শক্ত থাকে আর স্বপ্ন পূরণের প্রবল ইচ্ছা থাকে। নারীর জীবনে পথচলা কখনো সহজ নয়। তবে সবদিকে ভারসাম্য বজায় রেখে চললে পথচলা অনেকটাই সহজ হয়ে যায়। পুরো ব্যাপারটাই নির্ভর করে তার ইচ্ছাশক্তির ওপর। নারীরা সাহসী ও আত্মবিশ্বাসী হলে তাদের সব বাঁধা অতিক্রম করতে পারে যার একটি বাস্তব উদাহরণ হলো যুক্তরাষ্ট্রের ৪৯তম ভাইস প্রেসিডেন্ট হিসেবে নির্বাচিত কমলা হ্যারিস। দেশটির ইতিহাসে প্রথমবারের মতো কোনো নারী ভাইস প্রেসিডেন্ট হিসেবে হোয়াইট হাউসে যাচ্ছেন। কমলা হ্যারিস তার বিচক্ষণতা, যুক্তি আর ক্ষুরধার বুদ্ধির জোরে ডেমোক্রেটিক পার্টি ও তাদের প্রেসিডেন্ট প্রার্থী জো বাইডেনের নির্বাচনী প্রচারে এনেছিলেন দারুণ গতি।

অদম্য এক সাহসী বাঙালি নারীর নাম আইরিন জুবেদা খান। ছোটবেলাতেই স্বপ্ন দেখেছিলেন মানবাধিকার পরিস্থিতির উন্নয়ন নিয়ে কাজ করবেন। ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দের ভয়াল সেই দুঃসময় খুব কাছ থেকেই দেখেছিলেন পাকিস্তানী হানাদার বাহিনীর অত্যাচার। নিতান্তই কৈশোরোত্তীর্ণ এক বালিকা তখন তিনি। তারপর কত পথ পাড়ি দিলেন। কত চড়াই-উতরাই পেরিয়ে আজ তিনি এক কিংবদন্তিতে পরিণত হয়েছেন। সম্প্রতি জাতিসংঘে মতপ্রকাশের স্বাধীনতাবিষয়ক বিশেষ দূতের দায়িত্ব পেয়েছেন তিনি।

নিজের ঘর থেকে শুরু করে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এবং চলার পথ থেকে শুরু করে কর্মস্থল সকল ক্ষেত্রে নারীকে মুখোমুখি হতে হয় নানা প্রতিবন্ধকতার। নারীর দীর্ঘ সংগ্রামের পথ কখনো শুরু হয় তাঁর জন্মের মধ্যদিয়ে। পুত্রসন্তান ভূমিষ্ট হলে পরিবারে আকাশছোঁয়া আনন্দ। কন্যাসন্তান হলে সবার মন খারাপ। মেয়ে মানেই সংসারে বোঝা। আর ছেলে বংশরক্ষা করবে, রোজগার করবে, পরিবারে সবার অন্ন জোগাবে আর বৃদ্ধ বয়সে পরিবারের দায়দায়িত্ব সামলাবে। এই মানসিকতা সমাজে আজও বদ্ধমূল। খাওয়া-পরা, পুষ্টি, যত্ন-পরিচর্যা সবদিক থেকেই কন্যাসন্তান যেন অবহেলার পাত্রী। এরই চরম পরিণতি কন্যাভ্রূণ হত্যা অথবা কন্যা ভূমিষ্ট হবার পর তাকে পরিত্যাগ করা। পশ্চিমবঙ্গের এক গ্রামে রুবিনা বিবিকে বিষ খাইয়ে মেরে ফেলে তাঁর শ্বশুরবাড়ির লোকেরা। কেন? কারণ আল্ট্রাসাউন্ড করে তাঁর স্বামী জানতে পেরেছিলেন রুবিনার গর্ভে কন্যা সন্তান আছে।

উচ্চ বিদ্যালয়ের সীমানা পেরোতে না পেরোতেই বিয়ে হয়ে যায় অনেক নারীর। বিয়ের পরে পড়ালেখা চালাতে বিধিনিষেধ আরোপ করে স্বামী অথবা শ্বশুরবাড়ির লোকজন। তাদের এই বিধি-নিষেধের বিপক্ষে গিয়ে যদি কোন নারী পড়ালেখা চালিয়ে যেতে চান তাহলে তাকে শিকার হতে হয় শারীরিক ও মানসিক হয়রানি এবং পোহাতে হয় মধ্যযুগীয় কায়দায় শাস্তি। হাওয়া আক্তার জুঁই স্বামীর আক্রমণে হাতের সব আঙ্গুল হারান কারণ তিনি স্বামীর অমতে পড়ালেখা চালিয়ে গিয়েছিলেন। একবিংশ শতকের বাংলাদেশে স্বামীর অমতে পড়ালেখা চালিয়ে যাওয়ায় মধ্যযুগীয় কায়দায় শাস্তি দিতে চাপাতির এক কোপে তার ডান হাতের চারটি আঙুল কেটে নেয় তার নিয়ন্ত্রণবাদী স্বামী। স্বামী আঙুল কেটে নিয়েছে কিন্তু তার স্বপ্ন কেড়ে নিতে পারেনি। ২০১১ খ্রিস্টাব্দে আঙুল হারালেও ২০১২ খ্রিস্টাব্দে সে উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় অংশ নেয় এবং মানবিক বিভাগ থেকে জিপিএ ৪.৩০ পেয়ে উত্তীর্ণ হয়।

রুমানা মঞ্জুর ২০১১ খ্রিস্টাব্দে স্বামীর হাতে অমানবিক নির্যাতনের শিকার হয়ে চোখের আলো হারিয়ে অন্ধত্ববরণ করলেও তিনি নিজেকে হারিয়ে ফেলেন নাই। রুমানা মঞ্জুর নিজেকে লুকিয়ে ফেলেনি বরং তিনি উঠে দাঁড়িয়েছেন, ঘুরে দাঁড়িয়েছেন এবং চ্যালেঞ্জ নিয়েছেন। তিনি ব্রেইল শিখেছেন। আইন বিষয়ে বিদেশে পড়ালেখা করে নতুন ডিগ্রি নিয়ে সেখানে কাজ শুরু করেছেন। এই রকম চ্যালেঞ্জ নেয়ার গল্পের সংখ্যা যত বাড়বে, নারীরা আত্মপ্রত্যয়ী হয়ে ততবেশি সামনের দিকে এগিয়ে যাবে।

নারীকে নির্যাতনের শিকার হতে হয় তার কর্মক্ষেত্রে। কর্মক্ষেত্রে এখনো নারীরা হীনমন্য আপত্তিকর আচরণের শিকার হয়। কর্মস্থলে নারীর উপযুক্ত পারিশ্রমিক পাওয়া, পদোন্নতি স্বাভাবিকভাবে হয় না। এজন্য তাকে অনেক সময় অনেক কঠিন পরিস্থিতিতে পড়তে হয় এবং অনেক চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হতে হয়। আর কাজের ক্ষেত্রে নারীর নিজের যোগ্যতার প্রমাণ দিতে, সাধারণত যা থাকে নারীদের বেশি কাজ করে প্রমাণ করতে হয় যে পুরুষের চেয়ে দক্ষতার দিক থেকে সে পিছিয়ে নয়। নারীদের সুযোগ আসে কম। ফলে যে সুযোগ আসুক তার সঠিকভাবে কাজে লাগাতে পারতে হয় নইলে এগিয়ে যাওয়া কঠিন হয়।

একজন নারীকে যখন পরিবার এবং চাকুরী দুটো চালাতে হিমশিম খেতে হয় তখন তাকে পরিবার অথবা চাকরি যেকোনো একটি বেছে নিতে হয়। তখন তাকে বলা হয় যে হয় সংসার অথবা চাকুরী যেকোনো একটি তাকে বেছে নিতে হবে। ফলে নারী তখন এর মধ্যে যেকোনো একটি বেছে নিতে বাধ্য হয়।

একজন কর্মজীবী নারীর ভীষণ ব্যস্ত জীবনের ছকে বাঁধা রুটিন থাকে। খুব সকালে উঠে বাসার সকলের জন্য প্রয়োজনীয় খাবার তৈরি করে তারপর অফিসের জন্য তৈরি হয়ে অফিসের উদ্দেশে বেরিয়ে পড়ে। অফিসে এসেও কাজের ফাঁকে-ফাঁকে সন্তানের এবং পরিবারের অন্য সদস্যদের খোঁজ-খবর নিয়ে থাকে। অফিসের একজন দায়িত্ববান নারী কর্মী একজন মমতাময়ী মা যার পুরো পৃথিবী জুড়ে থাকে তার সন্তান এবং পরিবার। সফলতার পিছে অবশ্যই নারীর নিজের মনোবল এবং আত্মপ্রত্যয় থাকতে হবে। সকলের ক্ষেত্রে পরিবারের সাপোর্ট নাও থাকতে পারে। কিন্তু দৃঢ় মনোবল আর আত্মপ্রত্যয়ী হয়ে প্রত্যেক নারীর উচিত স্বাবলম্বী হওয়া কারণ আত্মনির্ভরশীলতা একজন নারীর আত্মসম্মান এবং আত্মবিশ্বাস বাড়ায়। যারা ভাবেন বিয়ে মানে নারীর ক্যারিয়ারের সমাপ্তি এবং সংসার ও অফিস দুটো একসাথে সামলানো সম্ভব না তাদের জন্য বলা নারী হিসেবে নয় একজন মানুষ হিসেবে নিজের মূল্যায়ন করতে শিখুন। কর্মক্ষেত্রের সফল অনেক নারী কর্মী আছে যারা অফিসের কাজ এবং পারিবারিক জীবন চমৎকার ব্যালেন্স করে চলছেন।

(৮২ পৃষ্ঠায় দেখুন)

সাদা কালো জীবন (৪)

মালা রিবেরু (পামার)

জীবন খুব বৈচিত্র্যময়, মানুষের জীবনে কখন যে কি হয়, তা বলা দুস্কর। কখনো কখনো হুটহাট সিদ্ধান্ত কারো কারো ধ্বংস করে, আবার কেউকে এর বোঝা সারাজীবন বহন করতে হয়। যেহেতু শিক্ষকতার পেশায় অনেক ছাত্রী/ছাত্রকে ক্লাশ নেওয়া ও কথা বলার সুযোগ হয়েছে এবং কথা বলার প্রেক্ষিতে অনেকের জীবন সম্পর্কে জানতে পেরেছি, যা আমাদের জন্য ভবিষ্যতের জন্য শিক্ষা, যা থেকে আমরা সাবধান হয়ে নিজের ও পরিবারের অন্যান্য সদস্যদেরকে সাবধান করে দিবো।

বিউটি (ছদ্মনাম) নামের মেয়েটি যখন ৩ বছর মেয়াদকালীন ডিপ্লোমা ইন মিডওয়াইফারি কোর্স ভর্তি হয়, তখন থেকে খুব চুপচাপ ছিলো, পড়াশুনায় এত ভালো না হলেও ক্লাশের বিভিন্ন কার্যাবলী, পরীক্ষা সঠিক সময়ে জমা দিতে চেষ্টা করতো। তিন বছর একজন মানুষের পাশে থাকলে, বিশেষত শিক্ষক হলে বোঝা হয় যে সেকি টেনেটুনে নাকি মনোযোগ সহকারে পড়াশোনা করছে। বিউটিকে দেখে মনে হতো, তার মধ্যে তীব্র একটা ইচ্ছা আছে নিজেকে তৈরি করার পাশাপাশি বাবা-মা, ভাই-বোনকে পড়াশুনা করিয়ে সুশিক্ষিত ও সুপ্রতিষ্ঠিত করা। পরিবারের বড় সন্তান হওয়ার দায়িত্ব ছিলো বেশি এবং অসচ্ছল হওয়ার কারণে প্রায় সময় উপবৃত্তি টাকা জমিয়ে বাড়িতে পাঠিয়ে দিতো।

৩য় (শেষ বর্ষে) এসে সবার মধ্যেই সিনিয়র ভাব চলে আসে, আমরা তাদেরকে শাসনের মাত্রা একটু কমিয়ে দেই, কারণ আর কয়েকদিন পড়ে চলে যাবে, বান্ধবীরা সবাই মিলে একটু মজা করুক। প্রায় ২২৫জন ছাত্রী সবসময় সবার খবর রাখা সম্ভব হয় না। ক্লাশে রোলকল করার সময় দীর্ঘদিন কেউ উপস্থিত না থাকলে, তাদের বান্ধবীদের মাধ্যমে খবর নেই অনুপস্থিতির কারণ, তাই তার রুমমেটদের মারফত জানতে পারলাম, পারিবারিক বিশেষ প্রয়োজনে বিউটি ১ সপ্তাহ ছুটিতে আছে ।

দুইদিন পরে বিউটি ছুটি শেষে আবার ইনস্টিটিউট ফিরে আসে এবং ক্লাশে ও যোগদান করেন, কিন্তু আগের কথাবার্তা ও আচার আচরণে আগে থেকে ভিন্নতা লক্ষ্য করা যায়। আমি মনে-মনে ভাবলাম , হয়তো দীর্ঘদিন পর বাড়ি থেকে আসার কারণে মন খারাপ লাগছে।

রাতে রুমে পড়াশুনা করছি, এমন সময় ঠক্‌ঠক্‌ শব্দে দরজা খুলে দেখি, বিউটি বির্মষ মুখে দাঁড়িয়ে আছে। রুমে ঢুকে আমাকে জড়িয়ে কান্না শুরু করে দিলো, ঘটনায় আকস্মিকতায় আমি হতভম্ব হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, কি হয়েছে বিউটি? তুমি স্বাভাবিক হয়ে আগে বস, তারপর আমাকে বলো। বিউটি বলল, ম্যাডাম আমি মানসিকভাবে খুবই ভেঙ্গে পড়েছি, আমার জীবনে গত এক সপ্তাহে এমন কিছু অপ্রত্যাশিত ঘটনা ঘটে গেছে, যার জন্য সব চিন্তা, পরিকল্পনা পরির্বতন হয়ে গেছে, জানি না কি করবো আপনার সাথে বলতে এসেছি, তাতে যদি কষ্টটা একটু লাঘব হয়। আমি তাকে শান্ত হয়ে বসে কি হয়েছে সংক্ষেপে বলতে বললাম।

বিউটি বললো, গত তিন বছর যাবৎ আমাকে আপনি দেখেছেন, যতটুকু আমি তার থেকে আরো বেশি যুদ্ধ করে আজকের এই পর্যন্ত এসেছি, কিন্তু গত সপ্তাহে বাড়ি থেকে ফোন বাবা খুব অসুস্থ, তাই জরুরী ছুটি নিয়ে বাড়ি যেতে বলে। বাবার অসুখের কথা শুনে তাড়াতাড়ি ছুটি নিয়ে বাড়ি গিয়ে বুঝতে পারলাম, আমাকে মিথ্যা কথা বলে বাড়ি নিয়ে আসা হয়েছে এবং আমার জন্য বিয়ে ঠিক করা হয়েছে পাশের গ্রামের শিক্ষিত ও বড়লোক ছেলের সাথে, প্রাইভেট কোম্পানীতে কাজ করে অনেক টাকা উপার্জন করে। মা-বাবার হাত-পা ধরে অনেক অনুনয়-বিনয় করলাম। আর বললাম, আমি অনেক পড়াশুনা করবো' আমার ছোট-ছোট ভাই-বোনদের সমাজে প্রতিষ্ঠিত করবো, আর সামনে আমার ফাইনাল পরীক্ষা, আমাকে অন্তত পরীক্ষা পর্যন্ত সময় দাও। কিন্তু কে শুনে কার কথা। প্রতিনিয়ত অভাবের সাথে যুদ্ধ করে ধনী পরিবার দেখে তাদের মাথার আর অন্য কিছু কাজ করছে না।

যাই হোক, পরাজিত সৈনিক আমি যুদ্ধে হেরে এক নিমিষে নিজের জীবনের চাওয়া-পাওয়াকে বিসর্জন দিয়ে তিনবার কবুল বলে মেয়ে থেকে বউ উপাধি নিয়ে স্বামীর বাড়িতে চলে আসলাম। কিন্তু সেখানে যে আমার জন্য বড় চমক অপেক্ষা করছিলো, তা ছিলো আমার কল্পনাতীত। সব নিয়মকানুন শেষে যখন বাসর ঘরে ঢুকি আমার স্বামীকে কিছু কথা বলে, মনে হয় পৃথিবীতে কিছু মানুষ জন্মগ্রহণ করে বিধাতা শুধু তাদের কপাল শুধু কষ্ট লিখে রাখে আমি মধ্যে একজন।

যত কষ্ট ইচ্ছা অনইচ্ছা থাকুক না বিয়ে যখন হয়ে গেছে বাসর রাতে অপেক্ষা করছি সেই স্বপ্নের পুরুষের যে কাছে আসলে মনের সব কথা বলবো, আমার স্বপ্নের কথা শেয়ার করবো। কিন্তু একটা প্রবাদ বাক্য "অভাগা যেদিকে যায়, সেদিকে সাগর শুকায়" আমার কপালে লেখা বিধাতা যা লিখে রেখেছে তার প্রমাণ হলো, আমার স্বামী যখন ঘরে ঢুকে আমাকে নিয়ে তার অভিব্যক্তি প্রকাশ করলো।

বাসর ঘরে ঢুকে কোন ভূমিকা ছাড়া শুরু করলো, দেখুন আমি কোন ভনিতা না করে সরাসরি বলছি, ছোটবেলা বাবা মারা যাওয়ার পরে আমার দুইবোন নার্সিং পাশ করে চাকুরী করে পরিবার দেখাশুনা ও আমাকে পড়াশুনা করে আমাকে আজ এই অবস্থানে নিয়ে এসেছে, ভার্সিটিতে পড়াকালীন আমি তমাকে কথা দিয়েছি, তাকে আমি বিয়ে করবো, তাকে ছাড়া থাকতে পারবো না, পরিস্থিতির কারণে আমি বাধ্য হয়ে আপনাকে বিয়ে করেছি। এই কথা শুনে আমার মাথার যেন বাজ পড়লো, বিধাতা আমার সাথে একি খেলা খেলছে! তারপর সে আর আমার সাথে কোন কথা না বলে বিছানার অন্যপাশে শুয়ে পড়লো, সারারাত পাশে একটা মানুষ বেঁচে আছি না মরে গেছি তার কোন খবর নেয়নি। পরের দিন সকালে অফিস থেকে জরুরী ফোন এসেছে বলে বাড়ি এসেছে, আজও তার খবর নেই। আমি তার বোন মা ও আমার বাবা-মায়ের সাথে এই ব্যাপারে কথা বলেছি, তারা আমার কাছে ক্ষমা চেয়েছে, বলেছে এই ব্যাপারে তারা কিছু জানে না, তাহলে হয়তো এই সিদ্ধান্ত তারা নিতো না। এখন আমার দায়িত্ব আমার ভালোবাসা দিয়ে

তাকে আপন করে নিতে।

এই পর্যন্ত গত সপ্তাহে আমার সাথে ঘটে যাওয়া ঘটনা, এখন আমি কি করবো কিছুই বুঝতে পারছি না, প্লিজ আমাকে সাহায্য করেন। আমি বললাম, আসলে যা ঘটার তাই ঘটেছে, তোমার বাবা-মা এত কষ্ট করে পড়ালেখা শিখিয়ে আজ এতদূর পর্যন্ত নিয়ে এসেছে, আর ১ মাস পরে তোমার ফাইনাল পরীক্ষার আগে এরকম সিদ্ধান্ত নেওয়া ঠিক হয়নি, কারণ এই পরীক্ষার ওপর তোমার সারাজীবন নির্ভর করছে, পাশাপাশি আমার মনে আরেকটা বড় ভুল যেটা মনে হয় যে, বিয়ে যেকোন মানুষের জীবনের খুবই গুরুত্বপূর্ণ অংশ, তোমার বাবা-মা হয়তো ভালোই চেয়েছিলো, তাই ভালোভাবে বুঝে-শুনে খোঁজ-খবর নিয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া দরকার ছিলো। বিয়ে যখন হয়ে গিয়েছে, এখন দেখো তা ধরে রাখা যায় কিনা। কিন্তু আমার তোমার কাছে একটা অনুরোধ জানি সবকিছু সহজে মেনে নেওয়া অনেক কষ্ট, কিন্তু তোমার ভবিষ্যতের কথা বলে তুমি মনোযোগ সহকারে পড়াশুনা করে একজন রেজিস্টার মিডওয়াইফ হও, চাকুরী করে স্বনির্ভর হও, তাহলে তোমার জীবন পাশাপাশি তোমার পরিবারকে সাহায্য করতে পারবে।

এরপর বিউটি পরীক্ষা পাশ করে চাকুরী করার পাশাপাশি স্বামীর সাথে যোগাযোগ চালিয়ে যাচ্ছে। এই পর্যন্ত আমার হোস্টেল থেকে যাওয়া পর্যন্ত ৬ মাসের কথা জানা ছিলো। গত এক সপ্তাহে আগে আমার আরেক ছাত্রী ফোন করে বললো, ম্যাডাম আমি আর বিউটি আপা এক হাসপাতালে কাজ করি, এক রুমে থাকি, আপনার সাথে একটু কথা বলতে চাই। আমিও বিভিন্ন ব্যস্ততার কারণে তার কথা ভুলে গেয়েছিলাম বললাম, আচ্ছা দাও। সালাম দিয়ে তার খবর জিজ্ঞেস করার পর বললো, সরি ম্যাডাম হোস্টল থেকে যাওয়ার পরে অনেক চেষ্টা করেছি তার সাথে যোগযোগ করতে, সে কিছুতেই আমার সাথে দেখা তো দূরের কথা, ফোন ধরিনি। অবশেষে ডিভোর্স হয়ে গেছে। এখন এই হাসপাতালে কাজ করছি, দোয়া করবেন পড়াশুনা করে নিজেকে যেন সুপ্রতিষ্ঠিত করতে পারি।

এই হলো আমাদের মতো হাজারো বিউটির জীবনে ঘটে যাওয়া ঘটনা যা আমরা অনেক সময় আবেগে বশবর্তী হয়ে বা লোভে পড়ে হুটহাট সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলি আর এর জন্য সারাজীবন কষ্ট ভোগ করতে হয়॥৵

বন্ধুর পথে নারীর এগিয়ে চলা

(৮০ পৃষ্ঠার পর)

সমাজের বিভিন্ন স্তরের নারীরা নিজেদের কৃতিত্ব দেখাতে সক্ষম হলেও যথাযথ মূল্যায়ন পাচ্ছে না। প্রতি পদে-পদে বৈষম্যের শিকার হচ্ছে। প্রতিনিয়ত নারীর ক্ষমতায়ন হওয়া সত্ত্বেও সামাজিক কুসংস্কার এর জন্য নারীরা পিছিয়ে আছে। নারীরা যদিও এখন নিজেদের কথা বলতে শুরু করেছেন কিন্তু এখনো অনেক পথ চলার বাকি। নারীদের কোন অজুহাতেই দমিয়ে না রেখে বরং তাদের সহযোগিতা করলে পরিবার, সমাজ এবং রাষ্ট্রের পরিবর্তনের ইতিবাচক প্রতিফলন ঘটবে। নারীর চলার পথ তীব্র কন্টকময় হলেও, অদম্য অভ্যন্তরীণ ইচ্ছা আর লড়াই-ই যেন তাদের করে তোলে অভিনব। নতুন বছরের আগমনের সঙ্গে প্রকৃতি আমাদের জানান দেয় আরো নতুন কিছু আশা, প্রত্যাশা, কর্তব্য ও দায়িত্ব গ্রহণের জন্য প্রস্তুত হতে। ২০২১ খ্রিস্টাব্দের এর আগমনের সঙ্গে সকল কুসংস্কার অভিশাপ থেকে মুক্ত হয়ে নারীর পথচলা হোক আরো সহজ আর প্রতিবন্ধকতামুক্ত॥৵

দি মেট্রোপলিটান খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ হাউজিং সোসাইটি লিঃ
THE METROPOLITAN CHRISTIAN CO-OPERATIVE HOUSING SOCIETY LTD.
Regd. No. - 202, Dated - 06.06.1978

অফিস পরিবর্তনের নোটিশ তারিখ: ১০ ডিসেম্বর, ২০২০ খ্রিস্টাব্দ

অত্যন্ত আনন্দের সাথে সম্মানীত সকল সদস্য-সদস্যা এবং সংশ্লিষ্ট সকলের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে "দি মেট্রোপলিটান খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ হাউজিং সোসাইটি লিঃ"- এর, প্রধান কার্যালয়ের সমস্ত কার্যক্রম আগামী ১৯ ডিসেম্বর ২০২০ খ্রিস্টাব্দ তারিখ রোজ শনিবার থেকে নিজস্ব স্থায়ী কার্যালয় আর্চবিশপ মাইকেল ভবন, ১১৬, ১১৬/১ মনিপুরীপাড়া, তেজগাঁও, ঢাকা-১২১৫-এ পরিচালিত হবে।

উল্লেখ্য যে, অত্র এলাকার সদস্য-সদস্যাদের দ্রুত সেবাদানের লক্ষ্যে চার্চ কমিউনিটি সেন্টার সেবাকেন্দ্র হিসেবে চালু থাকবে।

অফিসের বর্তমান ঠিকানা
চার্চ কমিউনিটি সেন্টার,
৯, তেজকুনীপাড়া, তেজগাঁও,
ঢাকা-১২১৫
ফোন: +৮৮ ০২ ৫৮১৫০০২৭

অফিসের পরিবর্তিত ঠিকানা
আর্চবিশপ মাইকেল ভবন
১১৬,১১৬/১ মনিপুরীপাড়া
তেজগাঁও, ঢাকা-১২১৫
ফোন: +৮৮ ০২ ৫৫০২৭৬৯১-৯৪

ধন্যবাদান্তে,
ইমানুয়েল বাপ্পী মন্ডল
সেক্রেটারি, ব্যবস্থাপনা কমিটি

বিঃদ্রঃ অফিসের ঠিকানা পরিবর্তনের বিষয়টি বিগত ৯ অক্টোবর ২০২০ খ্রিস্টাব্দ তারিখে ৩৩তম বার্ষিক সাধারণ সভায় সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদিত।

ক্ষমা

সাগর কোড়াইয়া

সহায়-সম্পত্তি বিক্রি করে দাদু যে অন্য জায়গায় চলে যাবে ভাবতে পারিনি। নিজের জন্মভিটা হাতছাড়া হওয়ার মতো কষ্ট বুঝি আর কিছু নেই! কৈশোর বয়সেই দাদুর বাবা মৃত্যুশয্যায়। মৃত্যুর আগের দিন দাদুকে ডেকে বাবা বলেছিলো যে, জন্মভিটা যেন কখনো বিক্রি না করে। শত কষ্ট হলেও যেন জন্মভিটা যক্ষের ধনের মতো আগলে রাখা হয়। কিন্তু দাদু তার বাবার কথা রাখতে পারেনি। যে বয়সে দাদুর ছেলেমেয়েদের সাহচর্যে থাকার কথা তখন নিজের ও স্ত্রীর মাথা গোজার ঠাঁই খুঁজতে হচ্ছে। সম্পত্তি বলতে গেলে কম ছিলো না। ধীরে-ধীরে হারাতে হয়েছে সব। দুইসন্তানকে প্রতিষ্ঠিত করে ভবিষ্যতের জন্য হাতে ও ব্যাংকে ভালোই জমা ছিলো। কিন্তু কিভাবে যে সেগুলো ক্ষয়ে গিয়েছে কেউ বলতে পারে না।

মেয়েকে বিয়ে দিয়ে দাদু ভেবেছিলো শ্বশুর বাড়িতে মেয়ে ভালোই থাকবে। কিন্তু স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিয়ের একমাস গড়াতে না গড়াতেই অশান্তি। এক সময় মেয়ে বাপের বাড়ি এসে হাজির। মোটা অঙ্কের টাকা নিয়ে আবার শশুড় বাড়ি। টাকা জোগাড় করতে দাদুকে জমি বিক্রি করতে হয়েছে। এরপরও আরো বেশ কয়েকবার মেয়ে এসে দাদুর কাছ থেকে টাকা নিয়ে যায়। ছেলেটাকে বিয়ে করানোর পর যে ঢাকা শহরমুখী হয়েছে; ফেরার আর নামগন্ধ নেই।

দাদু একবার খুবই কষ্ট পায়! যখন শুনে মেয়ে এবং মেয়ের জামাই দাদুর বাড়িটা দখল নেবার জন্য উঠে-পড়ে লেগেছে। অবশ্য সে ষড়যন্ত্র ভেস্তে যায়। নিজের মেয়ে যে এই রকম কাজ করতে উৎসাহী দাদু কোনভাবেই সে অংকটার হিসাব মেলাতে পারেনি। বারে-বার শুধু শুভঙ্করের ফাঁকি বলেই মনে হয়েছে ।

অনেকে ছেলেটাকে দোষ দেয়। আর দোষ দেবার কারণও আছে। যখন থেকে ছেলেটার চাকুরী চলে যাওয়াতে বাড়িতে এসে থাকতে শুরু করে তখনই দাদু একে-একে সব হারাতে বসে। বাড়িটা রাস্তার পাশে হওয়াতে দাদুর সুবিধাই হয়েছিলো। রাস্তা ঘেঁষে যে জমি তা পতিত ফেলে না রেখে মার্কেট তৈরি করে ভাড়া দিয়েছিলো। অবশেষে সে মার্কেটও বিক্রি করতে হয়েছে। মানুষের কাছে শুনি সে সময় একেবারে পানির দামে বিক্রি করা ছাড়া কোন উপায় ছিলো না।

অনেকে আফসোস ব্যতিত আর কিছুই করতে পারেনি।

কিন্তু কেন দাদু তার সমস্ত জমি-বাড়ি বিক্রি করলো সে সদুত্তোর কেউ দিতে পারে না।

ততদিনে দাদু রাস্তা থেকে দূরে এক টুকরো জমি কিনে বাড়ি করেছে। রাস্তায় দাঁড়িয়ে পশ্চিম দিকে তাকালে বাড়িটা দেখা যায়। যদিও ইটের গাঁথুনী তবু কেন যেন ইটের প্রতিটি টুকরোতে দরিদ্রতার ছাপ স্পষ্ট। দেখলেই বুঝা যায় একটু ভারি বৃষ্টিতে বাড়ির উঠানে পানি উঠে যাবে। সাপখোপ এসে বাসা বাঁধবে নির্দ্বিধায়।

দাদুর আসল নামটি কেউ জানে না। ছোট-বড় সবাই দাদুই ডাকে। দাদু ডাকার কারণে আসল নামটি এক সময় হারিয়ে গিয়েছে। পিতৃপ্রদত্ত নামটি নিয়ে কেউ তেমন আর মাথা ঘামায় না। পরিবারে শুধু বুড়াবুড়ি দুইজন। বয়সের কারণে একান্ত দরকার ছাড়া বাড়ির বাহিরে আসে না। বুড়ি এক সময় প্রতিদিন ভোরে গির্জায় আসতো। বাড়ি গির্জা থেকে একটু দূরে হওয়ায় এখন আর আসা হয় না।

একদিন সময় করে বিকালবেলা দাদুর বাড়িতে যাই। অনেক ঘুরে তবে যেতে হয়। রাস্তায় প্রায় এক হাঁটু সমান কাঁদা। যেতে কষ্ট হয়েছে খুব। গিয়ে দেখি দুই বুড়াবুড়ি বারান্দায় বসা। আমাকে দেখে দাদু খুব খুশী! বসলাম। অনেক গল্প হলো।

গল্পের এক ফাঁকে ছেলেমেয়ের কথা আসতেই বুড়িকে উঠে ঘরে চলে যেতে দেখলাম। দাদুর চোখে জল। দাদু কোন কথা বলতে পারছিলো না।

ছেলেমেয়ের কথা ঘুরিয়ে আমি অন্য কথা বলা শুরু করতেই দাদু বললো, ছেলেমেয়েদের কথা কি আর বলবো। নিজের ঔরস্যজাত সন্তান যে এমনভাবে ঠকাবে ভাবতেই পারিনি।

আমার কৌতুহল হলো। শোনার জন্য আরো কিছু যে জিজ্ঞাসা করবো তাও পারছি না।

তবু দাদু নিজে থেকেই বলতে থাকে, একবার আমি ভীষণ অসুস্থ। প্রাণ যায় যায় অবস্থা। মরার মতো বিছানায় পড়ে থাকি। কত ডাক্তার এলো গেলো কোন রোগ ধরতে পারেনি। খাবার যা খেতাম তা মাত্র স্যালাইন। ডাক্তার সকালে এসে পাইপের মাধ্যমে স্যালাইন পুশ করে যেতো। চলতে থাকতো সারাদিন। ভেবেছিলাম সে যাত্রায় আর ফিরবো না। তিনমাস অসুখের সাথে যুদ্ধ করে তবে ফিরি। ঐ তিনমাসের কোন স্মৃতিই স্মরণে আসে না। কিন্তু ইতোমধ্যে ক্ষতি যতটুকু হবার হয়ে গেছে। ছেলেটা সে সময় চাকুরী হারিয়ে স্ত্রী-সন্তান নিয়ে বাড়িতে বসা। শুনেছি ঢাকায় থাকাকালীন ঋণের পাহাড় জমিয়েছে। আমার অসুস্থতার সুযোগ নিয়ে ছেলেটা গোপনে জায়গা-জমি বিক্রি করতে শুরু করে। গ্রামেও ঋণের বোঝা বাড়াতে থাকে। ভাগিস্য; সে সময় আমি সুস্থ হয়ে ওঠি। নইলে যা অবশিষ্ট ছিলো তাও পঞ্চভূতের পেটে যেতো।

কি আর করবো ভেবে পাচ্ছিলাম না। মনে হচ্ছিলো- সুস্থ না হয়ে যদি মারা যেতাম তাহলে ভালো হতো হয়তোবা। কষ্টে গড়ে তোলা জমিগুলো হাতছাড়া হওয়া দেখতে হতো না। টাকার অভাবে নিজের ঔষধ পর্যন্ত কেনা বাদ দিয়ে দিয়েছি। একদিন ছেলের কাছে জমি বিক্রির টাকা চাইতেই বললো, টাকা দিয়ে পাওনাদারদের ঋণশোধ করেছে। রাগারাগি করেও লাভ নেই জানি। নিজেরই মান-সম্মান যাবে ভেবে চুপ করে গেলাম।

মাস না যেতেই টাকা পাওনাদারেরা এসে হাজির হতে থাকে। বেগতিক দেখে রাতের আঁধারে ছেলে স্ত্রী-সন্তান নিয়ে আবার ঢাকা চলে যায়। ওদের চলে যাওয়া আমি

(৯৮ পৃষ্ঠায় দেখুন)

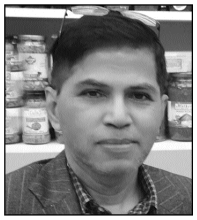

নবজাতক

পি আর প্ল্যাসিড

আকাশ বিয়ে করেছে দশ বছর প্রায় হবে। দশ বছরের মধ্যে তাদের সংসারে নতুন প্রজন্মের আগমন ঘটেনি। বিয়ের পর যে কোনো স্বামী-স্ত্রীই তাদের পরিবারে সন্তান প্রত্যাশা করে। যেকোনো কিছুর বিনিময়ে হলেও এমন প্রত্যাশা আকাশেরও। সমাজে বিয়ের পর সন্তান না হলে কেউ ভালো চোখে দেখে না। মনে করে, এটা কোনো অভিশাপ হবে হয়তো। এমন মুখরোচক অভিশাপের কথা থেকে রেহাই পাবার জন্য দেশে এবং ভারতে যে যেভাবে বলেছে সেভাবেই বিশ্বাস করে চেষ্টা করেছে অভিজ্ঞ ডাক্তারের শরণাপন্য হতে। এভাবে অনেক ডাক্তারকেই দেখিয়েছে। চিকিৎসাশাস্ত্র নয় শুধু, ধর্মীয়ভাবেও অনেকের সাথে পরামর্শ করেছে আকাশ এবং তার স্ত্রী। কোন কিছুতেই ফল হয়নি। বিষয়টি যেন অনেকটা প্রেসটিজ ইস্যু হয়ে দাঁড়িয়েছে তাদের জন্য।

আকাশের বিয়েটা ছিল অনেকদিনের ভালোবাসার পর। যেহেতু ভালোবেসে বিয়ে করেছে তাই অনেক কিছুর পরেও ভালোবাসাকে প্রাধান্য দিতে প্রায়ই বলে, আমরা বিয়ে করেছি ভালোবেসে, আমাদের দুইজনের সম্পর্কে তো কোন ঘাটতি নেই। ঈশ্বর যদি না চান তাহলে আমরা অযথা জোর করলে তো আর হবে না। বিয়ে যেহেতু করেছি সন্তান দেওয়া না দেওয়া পুরোটাই ঈশ্বরের ইচ্ছের উপর নির্ভর করে।

আকাশের স্ত্রীর নাম আনিকা। বিয়ের আগে আনিকা মনে-মনে সিদ্ধান্ত নিয়েছিল পরিবারে তাদের যত ঝামেলাই আসুক সুখের জন্য সে সবকিছু মানিয়ে নিতে চেষ্টা করবে। বিয়ের পর যখন কোনো সন্তান ধারণ করতে পারছিলো না তখন পরিবারের সবার কাছেই সে কিছুটা অন্য চোখে দেখতে শুরু করেছিল। এ ব্যাপারে ছেলের বাবা মা বা আত্মীয় স্বজন ছেলের দোষ কখনোই বলে না। সমস্যা না থাকলেও মেয়েদের বেলায় সব দোষ চাপায়। একইভাবে আনিকাকে বন্ধ্যা বলে তিরস্কারও করেছে কেউ কেউ। সব সে নীরবে সহ্য করেছে। যেহেতু আকাশ তার সাথে কোন খারাপ আচরণ করেনি কখনো তাই সে সবকিছুই মানিয়ে নিতে চেষ্টা করেছে। সে জানে এ জন্য যে তাকে মেরে ফেলা হবে। সন্তান হওয়া না হওয়া বিষয়ে আকাশ বা আনিকা তাদের দু'জনের কেউ কাউকে দোষ দেয় না। এটাই দু'জনের প্রতি দু'জনের ভালোবাসা এবং সান্ত্বনা।

বিয়ের পর আনিকা বছর দুই গ্রামের বাড়িতে শ্বশুর-শাশুড়ির সাথে ছিলো কিন্তু বাঙালি পরিবারে শাশুড়ি আর ছেলের বৌর মধ্যে ছোট-খাটো বিষয় নিয়ে অনেক সময় মন কষাকষি হয়ে থাকে। আনিকার বেলাতেও তেমন হয়েছে। আগে নিজেকে মানিয়ে নিতে পারলেও সন্তান না হওয়ার বিষয়ে আনিকাকে যেভাবে প্রতিনিয়ত কথা শুনতে হয় এতে সে আকাশকে বলে তার আর গ্রামে বসবাস করা সম্ভব না।

একসময় আকাশ সিদ্ধান্ত নেয় ঢাকা শহরে গিয়ে বাসা নেবার। প্রয়োজনে সেখানে দুইজনই চাকরি করবে। দরকার হলে মাস শেষে বেতনের টাকা থেকে কিছুটা বাঁচিয়ে আকাশ আর আনিকা বাড়িতে বাবা-মায়ের খরচ চালাবে। একসময় চলেও যায় তারা ঢাকা। ঢাকা যাবার আগেই চাকরি ঠিক করে। আকাশ করে এনজিও-তে আর আনিকা নেয় শিশুদের স্কুলে। গ্রাম থেকে শহরে গিয়ে সংসার চালাতে কোন সমস্যা হয় না। ব্যস্ততায় দিন কাটে। সময় সময় বাবা - মার সাথে গ্রামের বাড়িতে যোগাযোগ করে খোঁজখবর নেয়।

সারা বছর ওরা গ্রামে আসার সময় করতে পারে না। কাজ-কর্ম করে দু'জনই থাকে ক্লান্ত। সপ্তাহান্তে ছুটিছাটা যা পায় এতে ঘুমিয়ে এবং ঘরের কাজ করেই দিন পার করে। একমাত্র বড়দিন উপলক্ষেই লম্বা ছুটি পেলে বাড়ি যায়। এসময় যাওয়াটা বাধ্যতামূলক।

এসময় গ্রামে আসলে এলাকার সব লোকজন এবং আত্মীয়দের সাথে দেখা হয়। সবাই মিলে তখন বেশ আনন্দ করে বড়দিন উদ্‌যাপন করে। বড়দিন এবং ইংরেজি নববর্ষ উপলক্ষে বাড়ি এসে আনিকা এক সপ্তাহ বা তার বেশি সময় যাই থাকে তখন সে তার শ্বশুর-শাশুড়ির সেবা যত্নই করে।

ছেলেবেলায় আকাশ ধর্মবিশ্বাস করতো বেশ, ধর্মীয় আচার-আচরণ মেনেও চলত সব। বিয়ের পর সে যখন দেখে তাদের সংসারে কোন সন্তান আসছে না এমনকি ডাক্তারের পরামর্শ পর্যন্ত মিথ্যা হয়ে গেছে তখন বলতে শুরু করে, সে কোন ধর্মবিশ্বাস করে না। ধর্মটা আসলে কিছুই না, সামাজিক ভাবে মানবজাতির সুশৃংখলভাবে এক সাথে বাস করতে যে নিয়ম করা হয়েছে তার নাম ধর্ম। পাশাপাশি সে আনিকার উপর থেকে অনেকটা মন তুলে নিতে শুরু করে।

আকাশ আর আনিকা এক পর্যায় আলোচনা করে আকাশকে নতুন করে বিয়ে করতে। সাধারণভাবে বলতে গেলে বলা যায়, কোন মহিলাই জীবিত অবস্থায় সুস্থ মস্তিষ্কে স্বামীকে দ্বিতীয় বিয়ের সম্মতি দিতে পারে না। কিন্তু আকাশের বদলে যাওয়া বুঝতে পেরে আকাশের মুখের দিকে তাকিয়ে এবং তার সুখের জন্য আনিকা চোখ বন্ধ করে আকাশকে দ্বিতীয় বিয়েতে সম্মতি দেয়। সম্মতি দেবার পরও আকাশ গোপনে তার বিশ্বাস ধরে রাখার চেষ্টা করে। গোপনে সে প্রার্থনা করে তার সংসারে একটি সন্তান লাভের জন্য। তার এই বিশ্বাস আর গোপন প্রার্থনা আনিকার কাছে প্রকাশ করে না।

বড়দিন উপলক্ষে যখন বাড়ি যাবে তখন বাড়িতে বিশেষ প্রার্থনা করানোর কথা ভাবে আকাশ। আনিকা আকাশের এমন ধর্মের প্রতি বিশ্বাস দেখে কারণ জানতে চায়।

আকাশ বলে, সে মনে করে, মানত করলে তাদের ঘরে সন্তান আসবেই। এখনো বুড়ো হয়ে যায় নি। আন্তরিকতার সাথে এখনো যদি চেষ্টা করে ঈশ্বর তাদের দিকে মুখ তুলে তাকাতেও পারেন। এজন্যই প্রার্থণা করানোর কথা বলে।

বলেই আবার বলে, তোমার মনে কোন ইচ্ছে থাকলে তা কামনা করতে পারো। আমি সাধু আন্তনীর কাছে একটি সন্তান চেয়েছি। আনিকা জানে আকাশ যে সাধু আন্তনির প্রতি দুর্বল কিন্তু সন্তান সন্তান করে সেই বিশ্বাসে ভাটা পড়েছিলো। অনেকদিন পর তার বিশ্বাসে অটল থাকা দেখে অবাক হয়ে বলে-তুমি দেখো আমরা ঠিক একদিন সন্তানের মুখ দেখবোই। আসলে আমার মনে হয় কি জানো? এই সময়ে আমাদের বাবা মাই আমাদের বড় সন্তান। আমরা তাদের গর্ভে জন্ম নিয়েছি সে কথা যেন ভুলে না যাই। সম্ভবত সামান্য ভুল বোঝা-বুঝির কারণে আমরা যে তাদের থেকে দূরে সরে গেলাম এতে ঈশ্বর আমাদের পরীক্ষা